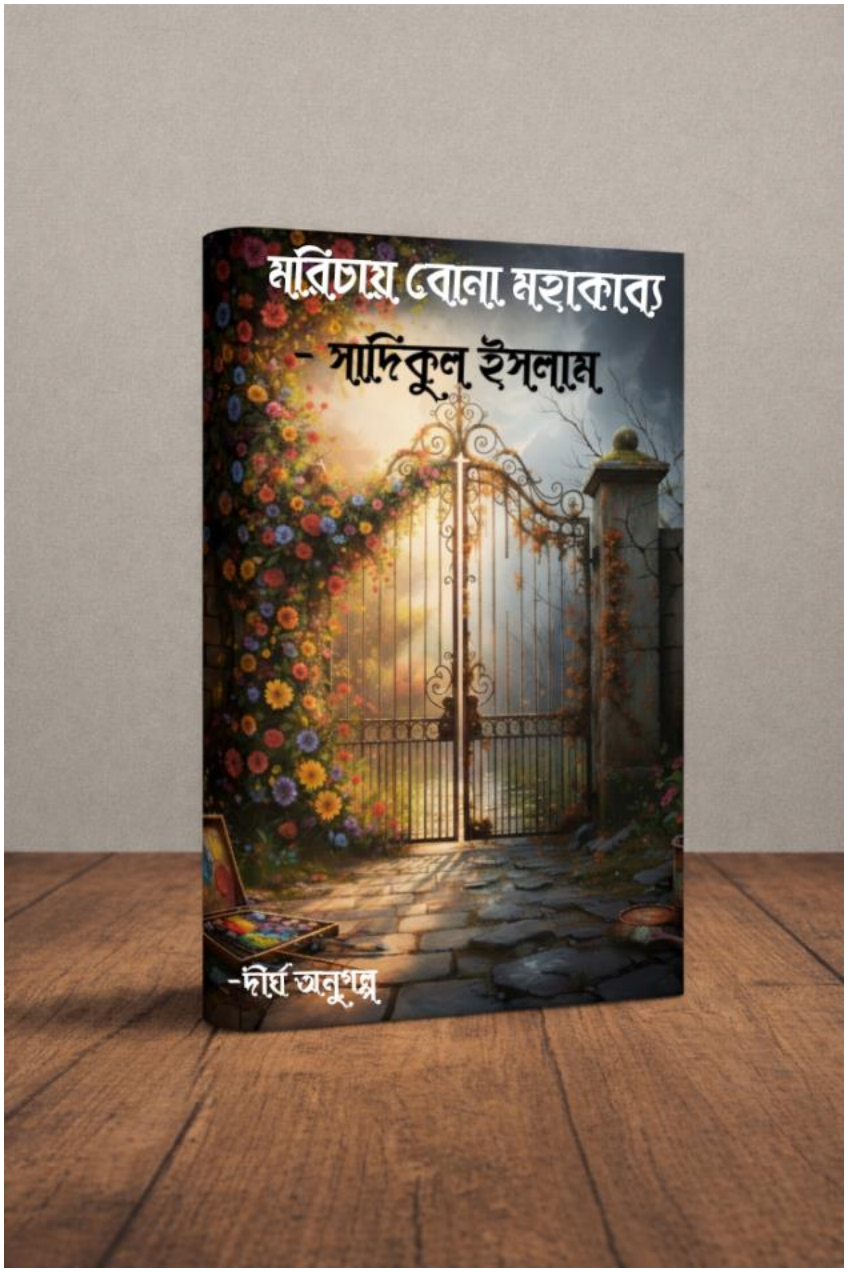
মরিচায় বোনা মহাকাব্য
- সাদিকুল ইসলাম
-দীর্ঘ অনুগল্প

মরিচায় বোনা মহাকাব্য

-সাদিকুল ইসলাম

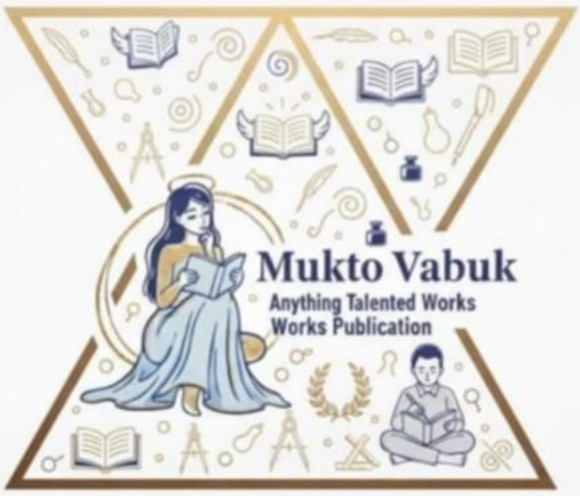

উৎসর্গ

অনিমেষ চৌধুরীর সেই নিঃসঙ্গ ইজি-চেয়ার আর সুলতা দেবীর না বলা গোপন চিঠির নামে।

উৎসর্গ করছি তাঁদের -

যাঁরা ধ্বংসস্তূপের নিচে দাঁড়িয়েও পুনর্জন্মের স্বপ্ন দেখতে জানেন,

আর বিশ্বাস করেন যে, জং ধরা লোহাও একদিন মহাকাব্যের অংশ হতে পারে।

এবং...

আমার সেইসব প্রিয় পাঠক/পাঠিকাদের,

যাঁরা গল্পের প্রতিটি বাঁকে মায়াভিলার ধূলিকণায় নিজেদের খুঁজে পেয়েছেন।

মুক্তভাবুক

সূচিপত্র

অধ্যায়	মূল উপজীব্য
১	মায়াভিলার হাহাকার
২	অভিশপ্ত উত্তরাধিকার
৩	নীলার আগমন
৪	অবিনাশের ডায়েরি
৫	জং ধরা সম্পর্কের বিষ
৬	প্রথম ক্যানভাসের রহস্য
৭	অয়নের প্রবেশ
৮	অগ্নিপরীক্ষা
৯	পাতালঘরের সন্ধানে
১০	মল্লিকার মুক্তি
১১	মরিচা ও পুনর্জন্ম
১২	ক্ষমা ও বিয়োগান্তক শেষ

Mukto Vabuk
Talented Works
Works Publication

১৩ রিচার্ড হ্যামিল্টনের হানা

১৪ লোভ বনাম মহিমা

১৫ শেষ বিষবৃক্ষ

১৬ অমর রঙের আবিষ্কার

১৭ দ্বাদশ ক্যানভাস

১৮ শিমুলের পদধ্বনি

১৯ মহাকবির প্রস্থান

২০ অন্তিম মহাকাব্য

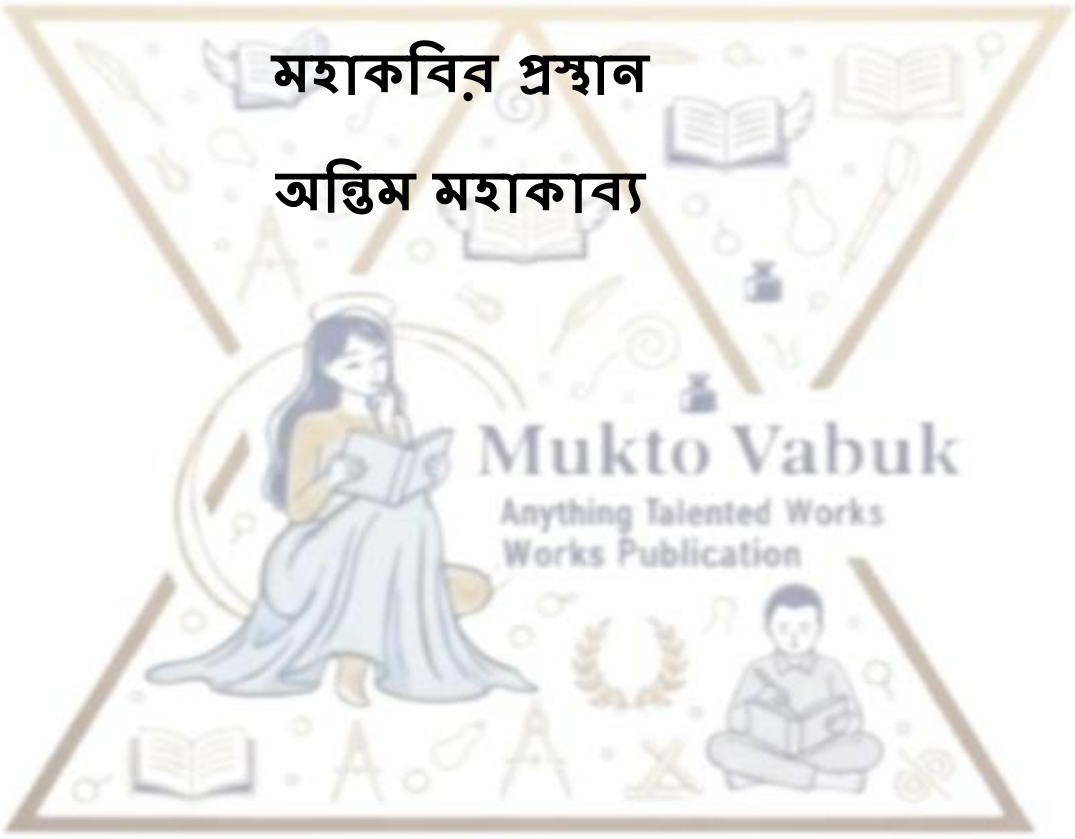

প্রথম অধ্যায়

মায়াভিলার হাহাকার

বিকেলের মরা রোদটা যখন শ্বেতপাথরের বারান্দায় এসে পড়ে, তখন পুরো বাড়িটাকে একটা প্রাচীন কঙ্কালের মতো মনে হয়। এই বাড়ির নাম মায়াভিলা। এক সময় এই বাড়ির প্রতিটি ইটের খাঁজে হাসির রঙ লেগে থাকত। বাগানে ছিল মরসুমি ফুলের মেলা। নীল, লাল, হলদে রঙের সমারোহে বাড়িটা যেন সবসময় কথা বলত। বাড়ির মালিক অনিমেষ চৌধুরী ছিলেন একজন জাত শিল্পী। তাঁর কাছে জীবন মানেই ছিল ক্যানভাস আর রঙ। কিন্তু সময় এক অদ্ভুত জাদুকর। সে মানুষের জীবন থেকে রঙ শুষে নিতে জানে। আজ সেই মায়াভিলার দেয়ালে শেওলা ধরেছে, জানলার গ্রিলগুলোতে ঘন হয়ে বসেছে কালচে মরচে। অনিমেষ বাবুর জীবনটাও যেন এখন সেই মরচে ধরা জানলার ওপাশ দিয়ে দেখা এক ধূসর আকাশ।

অনিমেষ বাবুর দিন কাটে ইজি চেয়ারে বসে। পাশে পড়ে থাকে আধখাওয়া চায়ের কাপ আর একটা পুরনো

ডায়েরি। ডায়েরির প্রথম পাতায় তিনি নিজের হাতে লিখেছিলেন রং ভরা জীবন জং ধরে শেষ এক পাশে, শুরু অন্য পাশে শেষ। এই দুটো লাইন এখন তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা।

অনিমেষ বাবুর স্ত্রী সুলতা ছিলেন এই বাড়ির প্রাণ। সুলতা যখন ঘরজুড়ে ঘুরে বেড়াতেন, তখন মনে হতো কোনো ঝরনা বয়ে যাচ্ছে। সুলতার প্রিয় ছিল নীল রঙ। অনিমেষ বাবু যখনই কোনো নতুন ছবি আঁকতেন, সেখানে কোথাও না কোথাও একটু নীল ছোঁয়া থাকত। সুলতা হাসতেন আর বলতেন–

“তুমি কি আমায় ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পাও না?”

অনিমেষ বাবু হাতের তুলিটা নামিয়ে রেখে বলতেন–

“রঙ তো সবাই দেখে সুলতা, আমি তো ওই রঙের আড়ালে লুকিয়ে থাকা প্রাণটাকে দেখি। আর আমার সব প্রাণের উৎস তো তুমি।“

সেই রঙিন দিনগুলোতে কোনো অভাব ছিল না, কোনো দীর্ঘশ্বাস ছিল না। ছিল শুধু পূর্ণতা। কিন্তু জীবনের এক পাশে যখন রঙের উৎসব চলে, অন্য পাশে তখন অলক্ষ্যে জং ধরতে শুরু করে। সুলতার ক্যান্সার ধরা পড়ল যখন, তখন বাড়ির বাগানটা ফুলে ফুলে ভরা ছিল। অদ্ভুত ব্যাপার, সুলতার শরীর যত ভেঙে পড়তে লাগল, বাগানের গাছগুলোও যেন একে একে মরতে শুরু করল। যে ঘরে হাসির শব্দ থামত না, সেখানে এসে জায়গা নিল ওষুধের কটু গন্ধ আর অক্সিজেনের সিলিন্ডারের শোঁ শোঁ শব্দ।

“জীবন বড় অদ্ভুত যখন আমরা রঙের সমুদ্রে ডুব দিই, তখন ভুলে যাই যে পাড়ের বালিতে নোনা জল আর মরচে আগে থেকেই অপেক্ষা করছে।“

সুলতা চলে গেলেন এক বর্ষার রাতে। সেই বৃষ্টির শব্দে মায়াভিলার সব রঙ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। অনিমেষ বাবু তাঁর আঁকার সরঞ্জামগুলো গুছিয়ে রাখলেন

এক অন্ধকার ঘরে। তুলিগুলোতে রঙ শুকিয়ে পাথর হয়ে গেল। ক্যানভাসে ধুলোর আস্তরণ পড়ল। এক সময়ের উজ্জ্বল অনিমেষ বাবু নিজেকে বন্দি করে ফেললেন এক ধূসর একাকীত্বে। যে হাত দিয়ে তিনি মহাবিশ্বের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতেন, সেই হাত এখন কাঁপতে থাকে। জীবনটা যেন একটা থমকে যাওয়া ঘড়ি। এক পাশে সব শেষ হয়ে গেছে, আর অন্য পাশে কেবল দীর্ঘশ্বাসের শুরু।

এভাবে কেটে গেল দীর্ঘ দশ বছর। মায়াভিলা এখন এক জীর্ণ অরণ্য। পাড়ার লোকে এটাকে বলে ‘ভূতুড়ে বাড়ি’। অনিমেষ বাবু মাঝে মাঝে ভাবেন, এই তো জীবন। এক সময় কত মানুষের আনাগোনা ছিল এই বাড়িতে, আর আজ দরজার কবজাতে জং ধরেছে বলে কড়া নাড়লেও শব্দ হয় না। ঠিক তখনই একদিন সেই নিস্তব্ধতা ভাঙল।

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

দরজায় টোকা পড়ল না, বরং একটা ভাঙা গলার গান ভেসে এল। পাশের বাড়ির নতুন ভাড়াটে হিসেবে এসেছে এক পরিবার। তাদের মেয়েটির নাম নীলা। বছর বাইশের এক চঞ্চল তরুণী, যার হাতে সবসময় একটা স্কেচবুক থাকে। সে ভুল করে এই জং ধরা গেট ঠেলে

ভেতরে ঢুকে পড়েছে। অনিমেষ বাবুকে দেখে সে ভয় পেল না, বরং মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল দেয়ালের সেই পুরনো কারুকার্যের দিকে।

নীলা বলল–

"দাদু, এই বাড়িটা তো একটা জীবন্ত কবিতা! আপনি কি জানেন আপনার জানলার গ্রিলের এই মরচেগুলো সূর্যাস্তের আলোয় কেমন তামাটে রঙের মতো জ্বলছে?"

অনিমেষ বাবু অবাক হলেন। যে মরচেকে তিনি ধ্বংসের প্রতীক মনে করতেন, একটি মেয়ে তাকে তামাটে রঙ বলছে? তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, এগুলো রঙ নয় দিদিভাই, এগুলো জং। জীবন যখন শেষ হয়ে আসে, তখন এমন জং-ই ধরে।

নীলা হাসল। তার হাসিতে যেন সুলতার সেই পুরনো ছোঁয়া ছিল। সে বলল, আপনি ভুল বলছেন দাদু। জং তো কেবল লোহার ওপর পড়ে না, জং পড়ে মানুষের মনে। আর এই জং পরিষ্কার করার একটাই উপায়

আবারও রঙ করা। আপনার এই এক পাশের শেষ থেকেই তো আমার নতুন কিছুর শুরু হতে পারে।

সেই থেকে নীলার প্রতিদিনের আনাগোনা শুরু হলো। সে জোর করে অনিমেষ বাবুর সেই বন্ধ ঘরটা খুলিয়ে ফেলল। ধুলো ঝেড়ে বের করল সেই পুরনো ক্যানভাস আর পাথর হয়ে যাওয়া তুলিগুলো। নীলা বুঝতে পারল, এই বৃদ্ধ মানুষটি আসলে একজন নিঃসঙ্গ শিল্পী, যিনি নিজের ভেতরে এক বিশাল সমুদ্রের নীল চেপে রেখেছেন।

“মানুষ মারা গেলে শেষ হয় না, মানুষ শেষ হয় তখন যখন তার স্বপ্নগুলোতে মরচে ধরে আর সে তা ঝাড়ার সাহস হারায়।“

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

এক বিকেলে নীলা এক বাক্স নতুন রঙ নিয়ে এল। অনিমেষ বাবুকে বলল–

“দাদু, আজ আপনাকে একটা ছবি আঁকতে হবে। আমার জন্য নয়, এই বাড়িটার জন্য।”

অনিমেষ বাবু প্রথমে রাজি হলেন না। তাঁর আঙুলগুলো কাঁপছিল। কিন্তু নীলা যখন সুলতার সেই প্রিয় নীল রঙের টিউবটা তাঁর সামনে খুলে ধরল, অনিমেষ বাবুর চোখের সামনে পর্দা সরে গেল। তিনি দেখলেন সুলতা দাঁড়িয়ে আছেন বাগানে, তাঁর পরনে সেই নীল শাড়ি।

অনিমেষ বাবু তুলি ধরলেন। প্রথম টানটা দিতেই মনে হলো হৃদস্পন্দন ফিরে পেয়েছেন। তিনি আঁকতে শুরু করলেন মায়াভিলার সেই জং ধরা রূপটাকে, কিন্তু তাতে মিশিয়ে দিলেন এক ঐশ্বরিক আলো। তিনি বুঝতে পারলেন, জীবন আসলে কখনো শেষ হয় না। এক জায়গায় যা জং ধরে শেষ মনে হয়, অন্য জায়গায় তা নতুন অভিজ্ঞতার রঙ হয়ে ধরা দেয়।

গল্পের এই পর্যায়ে এসে পাঠককে অনুভব করতে হবে সেই রূপান্তর। অনিমেষ বাবু এখন আর মৃত্যুর অপেক্ষা করেন না, তিনি এখন সূর্যাস্তের প্রতীক্ষা করেন কারণ তিনি জানেন কাল সূর্য আবার উঠবে। নীলা তাঁর

নাতনি নয়, কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারী হয়ে উঠেছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁর জীবনের এক পাশ অর্থাৎ সুলতার সঙ্গে কাটানো সময়টা শেষ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু 'অন্য পাশে' এই নতুনের শুরুটা ছিল অনিবার্য।

প্রায় দুই হাজার শব্দের এই জীবনকাব্য আমাদের শেখায় যে, হারানো মানেই ফুরিয়ে যাওয়া নয়। অনিমেষ বাবু এখন তাঁর ডায়েরির সেই লাইন দুটোর নিচে নতুন একটা লাইন যোগ করেছেন –

"মরচে আসলে বিনাশ নয়, মরচে হলো রঙের বিবর্তন।"

Mukto Vabuk
Anything Talented Works

আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই কিছু অংশ জং ধরা। কিছু স্মৃতি আমাদের কুঁকড়ে রাখে। কিন্তু মনে রাখবেন, জীবনের ক্যানভাসটা বড় বিশাল। এক কোণে অন্ধকার মানেই পুরো ছবিটা নষ্ট হয়ে যাওয়া নয়।

“আমরা সবাই কোনো না কোনো গল্পের শেষ পাতা, আবার আমরাই অন্য কারো গল্পের নতুন ভূমিকা।“

মায়াভিলার বাগান এখন আবার পরিষ্কার করা হয়েছে। নীলা সেখানে ছবি আঁকে, আর অনিমেষ বাবু বসে তাকে শেখান কীভাবে রঙের সাথে আলোর খেলা করতে হয়। বাড়ির গেটের সেই জং ধরা অংশটা তিনি আর রঙ করেননি। তিনি ওটা রেখে দিয়েছেন এটা মনে রাখতে যে ক্ষয় আছে বলেই নতুনের এতো মর্যাদা।

জীবনের অংকের হিসাবটা খুব সহজ এক পাশে যা বিয়োগ হয়, অন্য পাশে তা অন্য কোনো রূপে যোগ হয়ে যায়। তাই জং ধরা দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। জং সরিয়ে দিলেই সেখানে আবার উজ্জ্বল ধাতুর দেখা মেলে। আপনার জীবন যদি আজ জং ধরে শেষ হওয়ার পথে থাকে, তবে জানবেন আপনি আসলে এক নতুন শুরুর ঠিক দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।

মুক্তভাবুক

দ্বিতীয় অধ্যায়

অভিশপ্ত উত্তরাধিকার

মায়াভিলার নিস্তব্ধতা এখন আর ভয়ংকর নয়, বরং অনেকটা গভীর কোনো রাগের ধ্রুপদী সংগীতের মতো। প্রতিদিন বিকেলে নীলা যখন আসে, বাড়ির সেই ঝিমিয়ে পড়া বারান্দাটা প্রাণ ফিরে পায়। অনিমেষ বাবুর সেই পুরনো অন্ধকার ঘরটা এখন উন্মুক্ত। জানলা দিয়ে আসা রোদে ধুলিকণাগুলো যখন নাচে, তখন অনিমেষ বাবুর মনে হয় এগুলো শুধু ধুলো নয়, এগুলো স্মৃতির স্পন্দন।

সেদিন বিকেলে নীলা একটা বিশেষ জিনিস নিয়ে এল। লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা এক তাড়া পুরনো চিঠিপত্র। অনিমেষ বাবু অবাক হয়ে চশমাটা নাক বরাবর ঠিক করে বললেন–

"এসব কোথায় পেলি রে দিদিভাই?"

নীলা হাসিমুখে আলমারির তলা থেকে ধুলো ঝেড়ে বের করা চিঠিগুলো দেখিয়ে বলল–

এগুলো তো আপনার আর সুলতা দিদার ভালোবাসার দলিল দাদু! আপনি যখন বাগানে একা বসে থাকতেন, তখন দিদা নাকি এসব চিঠিতে আপনার জন্য কবিতা লিখতেন।

অনিমেষ বাবুর হাত কাঁপতে লাগল। হলুদ হয়ে যাওয়া কাগজগুলো ধরতেই একটা তীব্র শিউলি ফুলের গন্ধ তাঁর নাকে এল। দশ বছর পর আজ আবার সুলতার হাতের লেখা দেখে তাঁর চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠল। এক জায়গায় লেখা ছিল–

"অনিমেষ, তুমি আমার জীবনের ক্যানভাসে নীল রঙ ছড়িয়ে দিয়েছো ঠিকই, কিন্তু দেখো এই রঙ যেন কখনো ফিকে না হয়। যদি কোনোদিন আমি না থাকি, তবে মায়াভিলার প্রতিটি ইটের গায়ে আমার জন্য রঙ মেখো।"

অনিমেষ বাবু জানলার বাইরের মরা বাগানটার দিকে তাকালেন। তিনি এতদিন শোক পালন করছিলেন, কিন্তু

সুলতা তো চেয়েছিলেন উদ্‌যাপন। তিনি নীলার দিকে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে বললেন–

নীলা, আজ আমি শুধু ছবি আঁকব না। আজ থেকে আমরা এই মায়াভিলাকে নতুন করে সাজাবো। তবে কোনো আধুনিক রঙ দিয়ে নয়, এই বাড়ির পুরনো রূপটাকে শিল্পের ছোঁয়ায় ফিরিয়ে আনব।

শুরু হলো নতুন এক যজ্ঞ। নীলা আর অনিমেষ বাবু মিলে বাড়ির সেই জং ধরা গ্রিলগুলোকে পরিষ্কার করলেন না, বরং সেই মরিচাকেই মাধ্যম বানিয়ে তার ওপর সোনালি রঙের সূক্ষ্ম কাজ করলেন। যেটাকে লোকে ক্ষয় বলত, অনিমেষ বাবু সেটাকে এন্টিক আর্ট বা প্রাচীন শিল্পে রূপ দিলেন। মায়াভিলা যেন এক অদ্ভুত রূপ নিল অর্ধেক প্রাচীন, অর্ধেক উজ্জ্বল।

পাড়ার মানুষ যারা আগে এই বাড়িটিকে ভূতুড়ে বলে এড়িয়ে চলত, তারা এখন থমকে দাঁড়ায়। গেটের মরিচায় বোনা লতাপাতা আর তার ওপর অনিমেষ বাবুর তুলির টান দেখে তারা মুগ্ধ হয়।

একদিন কাজ করতে করতে নীলা হঠাৎ প্রশ্ন করল–

দাদু, জং ধরা লোহা তো এক সময় ভেঙে যায়। তবে আপনি কেন এটাকে আঁকড়ে ধরে আছেন?

অনিমেষ বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ম্লান হাসলেন। তিনি বললেন–

সবকিছু ভেঙে যাওয়াই শেষ নয় নীলা। একটা গাছ মরে গেলে সে মাটিতে মিশে যায়, কিন্তু সেই মাটি থেকেই তো নতুন চারা জন্মায়। এই মরিচা পড়া গ্রিলগুলো আমার অতীতে থাকার জেদ, আর তোমার দেওয়া এই সোনালি রঙগুলো হলো বর্তমানে বেঁচে থাকার আনন্দ। জং আর রঙের এই লড়াইটাই তো জীবন।

কিন্তু গল্পের মোড় ঘুরল অন্য জায়গায়। মায়াভিলার এই পরিবর্তনের খবর পৌঁছাল অনিমেষ বাবুর একমাত্র ছেলে অদীপ্তের কাছে, যে গত দশ বছর বিদেশের চাকচিক্যে বাবাকে ভুলে ছিল। হঠাৎ করে বাড়ির ভোলবদল আর দাম বেড়ে যাওয়ার খবর পেয়ে অদীপ্ত

ফিরে এল। কিন্তু সে শিল্প দেখতে আসেনি, সে এসেছে এই পুরনো জঞ্জাল বিক্রি করে ফ্ল্যাট বানাতে।

মায়াভিলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে অদীপ্ত কর্কশ স্বরে বলল–

বাবা, এই জং ধরা বাড়ি নিয়ে আর কতদিন? প্রোমোটারের সাথে কথা হয়েছে, এখানে মাল্টিস্টোরি বিল্ডিং হবে। তোমার এই ভাঙাচোরা দেয়াল আর রঙের ভেলকিবাজি দিয়ে পেট চলবে না।

অনিমেষ বাবুর হাতের তুলিটা মেঝেতে পড়ে গেল। যে নীলা তাঁকে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিল, সে অদীপ্তের দিকে তাকিয়ে শান্ত কিন্তু কঠিন গলায় বলল–

Mukto Vabuk
Anything Talented Works

সবকিছুর মূল্য টাকা দিয়ে হয় না অদীপ্ত বাবু। এই বাড়ির প্রতিটি মরিচায় একটা মহাকাব্য লেখা আছে, যা আপনার বোঝার ক্ষমতা নেই।

অনিমেষ বাবু তাঁর ডায়েরিটা হাতে নিলেন। আজ তিনি নতুন কিছু লিখবেন। এক পাশে যখন স্বার্থের জং ধরে, অন্য পাশে তখন ত্যাগের রঙ জ্বলে ওঠে।

মায়াভিলা কি তবে ভেঙে পড়বে? নাকি শিল্পের জাদুতে জয়ী হবে অনিমেষ বাবুর “মরিচায় বোনা মহাকাব্য”?

তৃতীয় অধ্যায়

নীলার আগমন

অদীপ্তের ফিরে আসা মায়াভিলার শান্ত পরিবেশে একটা বিষাক্ত ধোঁয়া ছড়িয়ে দিল। সে একা আসেনি, সাথে করে নিয়ে এসেছে এক প্রোমোটার আর কিছু আইনি কাগজ। তার চোখে এখন আর বাবার জন্য মমতা নেই, আছে শুধু শ্বেতপাথরের মেঝের বদলে কংক্রিটের দালান গড়ার নেশা।

অদীপ্ত চিৎকার করে বলছিল–

বাবা, এই জং ধরা পুরোনো বাড়ি আঁকড়ে ধরে বসে থাকার কোনো মানে হয় না। আমি অলরেডি ডিল ফাইনাল করে ফেলেছি। আগামী মাসেই এখানে কাজ শুরু হবে।

অনিমেষ বাবু পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। তাঁর হাতের তুলিটা কাঁপছে। ঠিক এই সময় নীলা

সামনে এসে দাঁড়াল। তার চোখে জল নেই, আছে এক অদ্ভুত জেদ। সে অদীপ্তর দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল–

অদীপ্ত বাবু, এই বাড়িটা শুধু ইট পাথরের নয়। এই বাড়ির দেয়ালে একটা গোটা প্রজন্মের শিল্প আর স্মৃতি মিশে আছে। আপনি চাইলেই এটাকে ভেঙে ফেলতে পারেন না।

অদীপ্ত তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল–

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

তুমি কে শুনি?

বাইরের একটা মেয়ে হয়ে বাড়ির ভেতরের ব্যাপারে কথা বলতে এসো না। নিজের রাস্তা দেখো।

নীলা কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। সে দ্রুত পায়ে মায়াভিলার সেই অন্ধকার স্টোররুমের দিকে চলে

গেল, যেখানে অনিমেষ বাবুর পুরোনো ট্রাঙ্কগুলো রাখা ছিল। কিছুক্ষণ পর সে বেরিয়ে এল একটা ধুলোমাখা নীল রঙের এনভেলাপ হাতে নিয়ে। খামটা অনিমেষ বাবুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নীলা বলল–

দাদু, এটা দেখুন। সুলতা দিদা এটা বোধহয় আপনার জন্যই রেখে গিয়েছিলেন।

অনিমেষ বাবু কাঁপাকাঁপা হাতে খামটা খুললেন। ভেতরে কোনো চিঠি নেই, বরং একটা আইনি দলিল আর একটা ছোট নোট।

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

নোটে লেখা–

অনিমেষ, আমি জানি আমার অবর্তমানে তুমি হয়তো ভেঙে পড়বে, আর এই মায়াভিলাকে রক্ষা করা তোমার জন্য কঠিন হবে। তাই এই বাড়ির একটি অংশ আমি আগে থেকেই..

দলিলটা পড়তেই অনিমেষ বাবুর চোখ কপালে উঠল। সুলতা দেবী মারা যাওয়ার আগে বাড়ির একটি বড়

অংশ তাঁর নামে নয়, বরং একটি ট্রাস্টের নামে করে দিয়ে গেছেন, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে শিল্পচর্চা। আর সেই ট্রাস্টের একজন ট্রাস্টি হিসেবে নীলার পরিবারের নাম উল্লেখ করা আছে!

অদীপ্ত কাগজটা কেড়ে নিয়ে দেখল। তার মুখ মুহূর্তেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কিন্তু সে দমে যাওয়ার পাত্র নয়। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল–

এই জাল কাগজ দিয়ে আমায় আটকানো যাবে না। আমি কোর্টে যাব।

ঠিক তখনই বাড়ির গেটে একটা কালো রঙের গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে নামলেন শহরের নামকরা এক আর্ট কিউরেটর। তিনি বাড়ির ভেতরের এই উত্তেজনা দেখেও সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তিনি সোজা অনিমেষ বাবুর কাছে গিয়ে বললেন–

মিস্টার চৌধুরী, আমরা খবর পেয়েছি আপনি আপনার এই ‘মরিচা সিরিজ’–এর ছবিগুলো নিয়ে একটি প্রদর্শনী করতে চাইছেন। আমরা এই বাড়িটিকেই একটি জীবন্ত

গ্যালারি হিসেবে ব্যবহার করতে চাই। আপনি কি রাজি?

অনিমেষ বাবু নীলার দিকে তাকালেন। নীলার মুখে তখন এক রহস্যময় হাসি। অনিমেষ বাবু বুঝতে পারলেন, এই কিউরেটরকে নীলাই খবর দিয়ে এনেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সুলতা দেবীর উইলে নীলার পরিবারের নাম এলো কীভাবে? সুলতার সাথে নীলার কি অন্য কোনো গোপন সম্পর্ক ছিল যা অনিমেষ বাবু নিজেও জানেন না?

বিকেলের রোদ তখন মায়াভিলার কার্নিশে এসে পড়েছে। জং ধরা গ্রিলগুলো থেকে এক টুকরো মরিচা খসে পড়ল মাটির বুকে। শুরু হলো এক নতুন লড়াই। একদিকে রক্তের সম্পর্কের দাবি, আর অন্যদিকে শিল্পের অধিকার।

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

অনিমেষ বাবু ডায়েরিতে লিখলেন–

মরিচা কেবল লোহার ক্ষয় করে না, তা কখনো কখনো ভেতরের কঠিন সত্যকেও বের করে আনে। আজ শুরু হলো মায়াভিলার আসল যুদ্ধ।

চতুর্থ অধ্যায়

অবিনাশের ডায়েরি

মায়াভিলার আকাশে আজ মেঘের আনাগোনা। সুলতা চলে যাওয়ার পর এই বৃষ্টিগুলো অনিমেষ বাবুর কাছে ছিল বিষাদমাখা, কিন্তু আজ জানলার গ্রিলে নতুন রঙের প্রলেপ পড়ার পর বৃষ্টির ছাঁটগুলোকেও মুক্তোর দানার মতো মনে হচ্ছে।

অদীপ্ত চলে যাওয়ার পর বাড়িটা একটু শান্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু থমথমে ভাবটা কাটেনি। সুলতার সেই উইলের কাগজটা অনিমেষ বাবুর টেবিলের ওপর রাখা। তিনি বারবার পড়েও মেলাতে পারছেন না। সুলতা যখন মারা যান, তখন তো নীলার জন্মই হয়নি প্রায়। তাহলে নীলার বাবার নাম সেই পুরনো দলিলে 'ট্রাস্টি' হিসেবে এল কী করে?

অনিমেষ বাবু নীলাকে ডেকে পাঠালেন। নীলা তখন বাগানে একমনে একটা জং ধরা টিনের বালতির ওপর কারুকার্য করছিল। ডাকার পর সে ঘরে এসে যখন দাঁড়াল, তার কপালে ঘাম আর হাতে নীল রঙের দাগ।

অনিমেষ বাবু চশমাটা পরিষ্কার করে জিজ্ঞেস করলেন, “নীলা, একটা কথা সত্যি করে বলবি? তোর বাবা অবিনাশ সেনকে কি আমার সুলতা চিনতেন?”

নীলা একটু থমকে দাঁড়াল। জানলার বাইরে তাকিয়ে সে ম্লান হাসল। তারপর ব্যাগ থেকে একটা জীর্ণ পুরনো ফোটো অ্যালবাম বের করল। ভেতরের একটা ছবি অনিমেষ বাবুর দিকে এগিয়ে দিল।

ছবিটা দেখে অনিমেষ বাবুর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা হিমেল স্রোত বয়ে গেল। এক তরুণী সুলতা দাঁড়িয়ে আছেন এক পাহাড়ি ঝরনার সামনে, আর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি অবিনাশ সেন নীলার বাবা। ছবির পেছনে সুলতার হাতের লেখায় লেখা–

“আমার শিল্পের প্রথম ছাত্র, অবিনাশ।”

নীলা বলতে শুরু করল, “বাবা আপনার কথা সবসময় বলতেন দাদু। বাবা একজন ভাস্কর হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অভাবের তাড়নায় ব্যাংকের ক্লার্ক হয়ে জীবন কাটাতে হয়েছে। তাঁর জীবনের সবটুকু অনুপ্রেরণা ছিল সুলতা দিদা। বাবা মারা যাওয়ার আগে আমায় বলেছিলেন– ‘নীলা, মায়াভিলায় যাস। ওটা শুধু একটা

বাড়ি নয়, ওটা একটা মন্দির। সেখানে একজন অভিমানী শিল্পী নিজেকে জং ধরা খাঁচায় বন্দি করে রেখেছেন।’”

অনিমেষ বাবু অবাক হয়ে শুনছিলেন। তাঁর চোখের সামনে থেকে কুয়াশা সরছে। সুলতা তবে নিঃশব্দে তাঁর শিল্পের উত্তরাধিকার তৈরির কাজ শুরু করে গিয়েছিলেন অনেক আগেই।

কিন্তু শান্তি এত সহজে আসার ছিল না। বিকেলের দিকে গেটে আবার কড়া নাড়ল কেউ। অদীপ্ত আসেনি, এসেছে এক উকিল। তার হাতে কোর্টের নোটিশ।

উকিল সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, “অনিমেষ বাবু, আপনার ছেলে অদীপ্ত চৌধুরী এই উইলের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। তাঁর দাবি, সুলতা দেবী যখন এই উইল করেছিলেন, তখন তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। ক্যান্সারের শেষ পর্যায়ে মরফিন আর ওষুধের প্রভাবে তিনি নাকি সুস্থ মস্তিষ্কে এই সিদ্ধান্ত নেননি।“

অনিমেষ বাবুর হাত থেকে চায়ের কাপটা পড়ে ভেঙে গেল। মরিচায় বোনা যে স্বপ্নটা ডালপালা মেলছিল,

তাতে আবার স্বার্থপরতার ঘুণপোকা কামড় বসাতে শুরু করেছে।

নীলা উকিলের হাত থেকে নোটিশটা একরকম কেড়ে নিল। তার চোখের তারা আজ জ্বলছে। সে বলল, “মরিচা লোহার শরীরের ওপর থাকে উকিল বাবু, কিন্তু রক্তে যখন মরিচা ধরে তখন মানুষ নিজের বাবাকেও চেনে না। কাল আমরাও কোর্টে যাব।“

অনিমেষ বাবু কাঁপাকাঁপা হাত দিয়ে আবার তুলিটা ধরলেন। তিনি বুঝতে পারছেন, লড়াইটা এখন আর শুধু মায়াভিলা বাঁচানোর নয়, লড়াইটা সুলতার সম্মান বাঁচানোর। তিনি ক্যানভাসে একটা বড় নীল রঙের বৃত্ত আঁকলেন, যার চারপাশটা ঘিরে ধরছে কালো জং ধরা সব শিকল।

ডায়েরির পাতায় নতুন লাইন যোগ হলো–

“কিছু যুদ্ধ জেতার জন্য তরবারি লাগে না, শুধু রঙের একটা টানই যথেষ্ট।“

নীলা কি পারবে অদীপ্তর এই চক্রান্ত রুখতে? আর অবিনাশের সাথে সুলতার সেই পুরনো সম্পর্কের কি আরও কোনো দিক আছে যা আজও অজানা?

পঞ্চম অধ্যায়

জং ধরা সম্পর্কের বিষ

মায়াভিলার অন্দরমহলে বৃষ্টির শব্দটা আজ ড্রাম বাজানোর মতো শোনাচ্ছে। ছাদের কার্নিশ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে সেই পুরনো শিউলি তলায়। অনিমেষ চৌধুরী তাঁর ইজি চেয়ারে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। হাতে ধরা উকিলের সেই নোটিশটা বৃষ্টির হাওয়ায় ফড়ফড় করে কাঁপছে। অদীপ্ত তাঁর নিজের সন্তান হয়ে সুলতার মতো একজন বিদুষী এবং পবিত্র নারীকে ‘মানসিক ভারসাম্যহীন’ বলতে পারল? এই প্রশ্নটা কাঁটার মতো তাঁর বুকে বিঁধছে।

Mukto Vabuk
Anything Talented Works

নীলা তখন পাশের ঘরে পুরনো ট্রাঙ্কগুলো থেকে সুলতার রাখা ডায়েরি আর ছবিগুলো গুছিয়ে রাখছিল। উকিলের আসার খবরটা তাকে বিচলিত করলেও সে সেটা মুখে প্রকাশ করছে না। বরং তার চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। সে জানে, এই লড়াইটা এখন আর আবেগ দিয়ে জেতা যাবে না, এখন বুদ্ধির চাল চালতে হবে।

অনিমেষ বাবু ধীর গলায় ডাকলেন, “নীলা, একবার এদিকে আসবি?”

নীলা ঘরে এসে দেখল অনিমেষ বাবুর চোখদুটো কেমন ঘোলাটে হয়ে গেছে। তিনি বললেন, “অদীপ্তকে আমি বড় অভাবের মধ্যে মানুষ করেছি নীলা। যখন আমার ছবি বিক্রি হতো না, তখন সুলতা তাঁর নিজের গয়না বন্ধক রেখে অদীপ্তকে স্কুলের ফি দিয়েছে। আজ সেই ছেলে বলছে তাঁর মা সুস্থ মস্তিষ্কে ছিল না? এই মরিচা তো লোহার নয় রে নীলা, এই মরিচা অদীপ্তর রক্তে ধরেছে।“

নীলা হাঁটু গেড়ে অনিমেষ বাবুর সামনে বসল। তাঁর কাঁপাকাঁপা হাত দুটো নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বলল, “দাদু, আপনি ভেঙে পড়লে অদীপ্ত বাবু জিতে যাবেন। সুলতা দিদা জানতেন এমন কিছু হতে পারে, তাই তো তিনি বাবার নাম ওই উইলে রেখে গেছেন। কিন্তু আমাদের এখন প্রমাণ করতে হবে দিদা তখন পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন। আমাদের এমন কাউকে দরকার যিনি ওই সময় দিদার চিকিৎসার সাথে যুক্ত ছিলেন।“

অনিমেষ বাবু চিন্তায় ডুব দিলেন। দশ বছর আগের কথা। সেই সময়ের ডাক্তাররা এখন কোথায় কে জানে! তবে সুলতার একটা অভ্যাস ছিল, তিনি ছোট বড় সব প্রেসক্রিপশন আর ওষুধের রসিদ যত্ন করে রাখতেন।

সারাটা দুপুর আর বিকেল কেটে গেল মায়াভিলার ধুলোমাখা স্টোররুমে। নীলা আর অনিমেষ বাবু মিলে পুরনো কাগজপত্রের স্তূপ ঘাঁটতে লাগলেন। এই ঘরটা যেন এক বিস্মৃত সময়ের জাদুঘর। এখানে পড়ে আছে পুরনো ক্যানভাস, ভাঙা ফ্রেম আর এক কোণে সুলতার প্রিয় হারমোনিয়ামটা যেটাতে এখন উইপোকা বাসা বেঁধেছে।

কাগজ খুঁজতে খুঁজতে নীলার হাতে একটা পুরনো চামড়ার ব্যাগ এল। ব্যাগের ভেতর কয়েকটা ডায়েরি আর একটা ক্যাসেট প্লেয়ার। নীলা কৌতূহলী হয়ে ক্যাসেটটা প্লেয়ারে ঢোকালো। ব্যাটারি নেই বলে খুব কষ্টে ঘড়ঘড় করে শব্দ হলো, তারপর একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

সুলতার গলা!

অনিমেষ বাবু শব্দটা শুনেই থমকে গেলেন। ক্যাসেটে সুলতা বলছেন–

অনিমেষ, আমি জানি আমার শরীর আর বেশিদিন সায় দেবে না। ডাক্তার চ্যাটার্জি আমায় বলেছেন অপারেশনটা সাকসেসফুল হওয়ার চান্স কম। অদীপ্ত বারবার এসে বাড়ির কাগজের কথা বলছে, কিন্তু আমি জানি ও এই বাড়িটা বিক্রি করে দেবে। আমি সেটা হতে দেব না। অবিনাশকে আমি সব বুঝিয়ে বলেছি। এই বাড়ির আত্মা তোমার তুলিতে বেঁচে থাকবে..

অনিমেষ বাবুর চোখে জল বাঁধ মানল না। সুলতা মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়েও অদীপ্তর আসল রূপ চিনতে পেরেছিলেন।

পরদিন সকালে অদীপ্ত আবার এল। তবে এবার একা নয়, সাথে করে একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ নিয়ে এসেছে। অদীপ্তর চাল হলো, সে বাবাকে দিয়ে সই করিয়ে নেবে যে সুলতা ওই সময় ভ্রমের মধ্যে ছিলেন।

অদীপ্ত ঘরে ঢুকে বলল–

“বাবা, বেকার জেদ করো না। ডাক্তার বাবু এসেছেন, উনি তোমাদের সাথে কথা বলবেন। কোর্টে যাওয়ার আগে সেটেলমেন্ট করে নেওয়া ভালো। না হলে নীলার মতো এই বাইরের মেয়েগুলোকেও পুলিশে দিতে বাধ্য হবো ।”

নীলা ড্রয়িংরুমের পর্দা সরিয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে এল। তার হাতে সেই ক্যাসেট প্লেয়ারটা। সে অদীপ্তর দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল–

“অদীপ্ত বাবু, বাইরে কে আর বাড়ির লোক কে সেটা আজ এই ক্যাসেটটা ঠিক করে দেবে। আপনার মা নিজেই আপনার ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন।”

অদীপ্তর মুখটা মুহূর্তের জন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেল, কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল–

“এইসব পুরনো ক্যাসেট দিয়ে ভয় দেখাচ্ছ? ওসব এডিট করা যায়। আইন প্রমাণ চায়।”

নীলা তখন মায়াভিলার সেই বিখ্যাত জং ধরা জানলাটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল। সেখানে একটি গাড়ি এসে থেমেছে। গাড়ি থেকে নামলেন সত্তরোর্ধ্ব এক

বৃদ্ধ, যাঁর চোখে চশমা আর হাতে একটা পুরনো ব্রিফকেস।

অনিমেষ বাবু চিনতে পারলেন। ইনি ডক্টর অমল চ্যাটার্জি সুলতার শেষ দিনগুলোর চিকিৎসক।

নীলা বলল–

"ডাক্তার বাবু আজ শুধু ডাক্তার হিসেবে আসেননি, তিনি সুলতা দিদার সেই উইলের একজন সাক্ষী হিসেবে এসেছেন। দিদা যখন উইল সই করেন, তখন ডক্টর চ্যাটার্জি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি সার্টিফাই করেছেন যে দিদার মানসিক অবস্থা তখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল।"

অদীপ্ত এবার রেগে ফেটে পড়ল। "নীলা, তুমি আমার ফ্যামিলি ম্যাটারে ঢোকার কে? বাবার সম্পত্তি আমি বুঝে নেব।"

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

নীলা এবার আলমারি থেকে একটা পুরনো খতিয়ান বের করে আনল। "আপনি সম্পত্তির কথা বলছেন তো? এই দেখুন মায়াভিলার ট্যাক্স রেকর্ড। গত সাত বছর ধরে এই বাড়ির ট্যাক্স আর মেইনটেন্যান্স আপনি তো দেননি, দিয়েছেন আমার বাবা অবিনাশ সেন।

সুলতা দিদার অনুরোধে বাবা একটা ফান্ড তৈরি করেছিলেন। এই বাড়িটার ওপর আপনার চেয়ে আমার বাবার অধিকার অনেক বেশি।“

অদীপ্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে কোনোদিন ভাবেনি এই সেকেলে বাড়িটার পেছনে এত বড় একটা আইনি ব্যারিকেড তৈরি করে রাখা আছে।

ডক্টর চ্যাটার্জি অনিমেষ বাবুর পিঠে হাত রেখে বললেন, “অনিমেষ, সুলতা খুব দূরদর্শী মহিলা ছিলেন। তিনি জানতেন মায়াভিলার এই জং ধরা ইটের নিচে চাপা পড়ে থাকা শিল্পটাকে একদিন কেউ না কেউ ঠিক উদ্ধার করবে। অদীপ্ত, তোমার এখানে আর থাকা ঠিক হবে না।“

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

অদীপ্ত রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, যাওয়ার সময় শুধু বলে গেল–

“আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব। কোর্টেই দেখা হবে।“

বাড়িটা আবার শান্ত হলো। কিন্তু অনিমেষ বাবু জানতেন, এটা ঝড়ের আগের স্তব্ধতা। অদীপ্ত সহজে ছাড়বে না।

সেদিন রাতে বারান্দায় বসে অনিমেষ বাবু নীলাকে জিজ্ঞেস করলেন,

“তুই ডক্টর চ্যাটার্জিকে খুঁজে পেলি কোথায়?”

নীলা ম্লান হেসে বলল, “বাবা ডায়েরিতে লিখে গিয়েছিলেন দাদু। বাবা বলতেন- বিপদে পড়লে মায়াভিলার দেয়ালে কান পাতবি, দিদা তোকে রাস্তা দেখিয়ে দেবে। আমি শুধু পুরনো কাগজগুলো ঠিকমতো খুঁজেছি।“

অনিমেষ বাবু অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি ভাবছেন সুলতার কথা। যে নারীকে তিনি ভেবেছিলেন শুধুই নরম হৃদয়ের শিল্পপ্রেমী, তিনি আসলে কতটা লড়াকু ছিলেন।

হঠাৎ নীলা প্রশ্ন করল, “দাদু, আপনি ওই নীল বৃত্তটা কেন এঁকেছিলেন? যার চারদিকে কালো শিকল?”

অনিমেষ বাবু বললেন, “ওটা আমার জীবনের ছবি নীলা। সুলতা হলো সেই নীল বৃত্ত, আর এই পৃথিবীটা হলো সেই মরিচা ধরা শিকল। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, শিকলগুলো পুরনো হয়ে ভেঙে পড়ে, কিন্তু নীল রঙটা থেকে যায়।”

গল্পের এই ধাপে এসে মায়াভিলা এক নতুন সংগ্রামের মুখে দাঁড়িয়ে। অদীপ্ত কি কোর্টে গিয়ে জালিয়াতের আশ্রয় নেবে? আর নীলা কেন বারবার নিজের বাবার কথা বলছে কিন্তু নিজের মায়ের কথা একটিবারও বলছে না? নীলার অতীতে কি আরও বড় কোনো অন্ধকার লুকিয়ে আছে?

মায়াভিলার প্রতিটি ইটের খাঁজে এখন রহস্যের নতুন প্রলেপ পড়ছে। জং ধরা জানলার ওপাশে নতুন ভোর হওয়ার অপেক্ষা।

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম ক্যানভাসের রহস্য

ডক্টর চ্যাটার্জি চলে যাওয়ার পর মায়াভিলার ড্রয়িংরুমে যে স্তব্ধতা নেমে এল, তা যেন বৃষ্টির শব্দের চেয়েও ভারী। অনিমেষ চৌধুরী ডায়েরির পাতাগুলো উল্টাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর মন পড়ে আছে সেই ক্যাসেটের শব্দে। সুলতার কণ্ঠস্বর তাঁর কানে এখনো বাজছে। তিনি জানতেন সুলতা বুদ্ধিমতী, কিন্তু তিনি যে এত গভীর চাল চেলে রেখেছিলেন তা ছিল কল্পনার বাইরে।

নীলা এক কোণে বসে রঙগুলো গুছিয়ে রাখছিল। আজ তাকে অন্যদিনের চেয়েও বেশি গম্ভীর লাগছে। তার চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু একটা আছে যা অনিমেষ বাবুকে ভাবিয়ে তুলছে। তিনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, “নীলা, একটা কথা অনেকক্ষণ ধরে ভাবছি। তোর বাবা অবিনাশ তো সুলতার ছাত্র ছিল, সেটা বুঝলাম। কিন্তু তুই নিজের মায়ের কথা কখনো বলিস না কেন রে? তোর মা কোথায়?”

নীলার হাতের রঙের টিউবটা থেকে এক ফোঁটা গাঢ় লাল রঙ মেঝেতে পড়ে গেল। ঠিক যেন রক্তের একবিন্দু ছোপ। সে মাথা নিচু করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল–

"আমার মা নেই দাদু।

যখন আমার বয়স মাত্র পাঁচ, তখন মা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। বাবার ডায়েরিতে লেখা ছিল, মা নাকি এই মায়াভিলার ছবি আঁকা আর বাবার শিল্পচর্চা সহ্য করতে পারতেন না। তিনি চেয়েছিলেন একটা ঝকঝকে আধুনিক জীবন, যা বাবা দিতে পারেননি।"

অনিমেষ বাবু অবাক হলেন। শিল্পের জন্য তবে শুধু তিনি একাই ত্যাগ করেননি, অবিনাশও চড়া মূল্য চুকিয়েছেন। তিনি বুঝতে পারলেন, নীলা কেন এই বাড়িটাকে এত ভালোবাসে। এটা তার কাছে শুধু একটা বাড়ি নয়, তার বাবার হারানো স্বপ্ন আর শ্রদ্ধার স্থান।

পরদিন সকালে কোর্টের নোটিশের পাল্টা জবাব দেওয়ার জন্য এক তরুণ আইনজীবীকে নিয়ে এল নীলা। নাম অয়ন। অয়ন মায়াভিলার প্রতিটি ঘর ঘুরে দেখতে দেখতে বলল, "অনিমেষ বাবু, লড়াইটা সহজ হবে না।

অদীপ্ত সাহেব শহরের সবচেয়ে দামী উকিল নিয়োগ করেছেন। তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করবে যে সুলতা দেবী যখন উইল করেছিলেন, তখন তিনি ওষুধে আচ্ছন্ন ছিলেন। আমাদের কাছে ডক্টর চ্যাটার্জি আছেন ঠিকই, কিন্তু আমাদের আরও জোরালো প্রমাণের দরকার এমন কিছু যা সুলতা দেবীর সেই সময়ের সৃজনশীলতা প্রমাণ করে।”

অনিমেষ বাবু ভাবনায় পড়লেন। সৃজনশীলতা? সুলতা তো শেষ জীবনে ছবি আঁকতেন না। তিনি শুধু ডায়েরি লিখতেন আর মাঝে মাঝে গান গাইতেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, সুলতা মৃত্যুর মাসখানেক আগে একটা বড় প্যাকেট আলমারির একদম ওপরে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “অনিমেষ, এটা এখন খুলো না। যখন সময় থমকে যাবে, তখন এটা বের করো।”

অনিমেষ বাবু আর অয়ন মিলে সেই প্যাকেটটা বের করলেন। ধুলোর আস্তরণ সরিয়ে যখন প্যাকেটটা খোলা হলো, সবাই অবাক হয়ে গেল। ভেতরে ছিল ১২টি ছোট ছোট ক্যানভাস। প্রতিটিতে মায়াভিলার এক একটি ঘরের ছবি আঁকা, কিন্তু সেগুলো সাধারণ ছবি নয়। প্রতিটি ছবিতে একটি করে সংকেত লুকানো আছে।

নীলা ছবিগুলো খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে চিৎকার করে উঠল, “দাদু, দেখুন! এই ছবিগুলো তো দিদা এঁকেছেন যখন তাঁর কেমোথেরাপি চলছিল। তারিখগুলো দেখুন। এতো সূক্ষ্ম কাজ কোনো অপ্রকৃতিস্থ মানুষ করতে পারে না। প্রতিটা ছবিতে সুলতা দিদা কোনো না কোনো আইনি নথির নম্বর বা আলমারির চাবির হদিস দিয়ে গেছেন!”

অয়ন উত্তেজিত হয়ে বলল,-

“এটাই তো আমাদের তুরুপের তাস”

যদি আমরা আদালতে প্রমাণ করতে পারি যে এই জটিল শৈল্পিক কাজগুলো তিনি ওই সময় করেছেন, তবে অদীপ্ত সাহেবের সব দাবি ধুলোয় মিশে যাবে। কারণ এমন ডিটেইলস কোনো অসুস্থ মস্তিষ্ক থেকে বের হওয়া সম্ভব নয়।

ঠিক সেই মুহূর্তে মায়াভিলার গেটে একটা বড় ট্রাক এসে থামল। সাথে একদল লেবার আর অদীপ্ত। অদীপ্ত এবার গায়ের জোরে বাড়ির একাংশ দখল করতে এসেছে। তার হাতে একটা স্টে-অর্ডারের কাগজ।

অদীপ্ত চেঁচিয়ে বলল–

“আইন আইনের পথে চলবে, কিন্তু এই বাড়ির সামনের বাগানটা আমার। আমি আজই এখানে বাউন্ডারি ওয়াল দেব। দেখি আমাকে কে আটকায়!”

লেবাররা কুঠার আর কোদাল নিয়ে বাগানের সেই প্রিয় শিউলি গাছটার দিকে এগিয়ে গেল। যে গাছটা সুলতা নিজের হাতে পুঁতেছিলেন। অনিমেষ বাবু বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর সারা শরীর কাঁপছে রাগে আর অপমানে। তিনি বললেন-

“অদীপ্ত, ওই গাছে হাত দিলে আমি আজ আত্মাহুতি দেব!”

অদীপ্ত হাসল। “নাটক করো না বাবা। জমি আমার, আমি যা খুশি করব।“

নীলা তখন দৌড়ে বাগানে গিয়ে গাছের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার হাতে একটা বড় ছুরি। সে নিজের হাতটা একটু কেটে ফেলল। রক্ত চুইয়ে পড়ছে গাছের গোড়ায়। সে শান্ত গলায় বলল, “অদীপ্ত বাবু, এই বাগানটা এখন একটা লিগ্যাল ডিসপিউটের আন্ডারে আছে। আপনি যদি আজ এখানে জোর করে কাজ শুরু করেন, তবে আমি আপনার নামে ফৌজদারি মামলা করব। আর এই

রক্ত? এটা সাক্ষ্য দেবে যে আপনি একজন বৃদ্ধকে আর এক তরুণীকে আক্রমণ করেছেন।

অদীপ্তর লেবাররা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। রক্তের দাগ দেখে তারা আর এগোতে সাহস পেল না। অদীপ্ত বুঝতে পারল, নীলা যতটা সাধারণ মেয়ে মনে হয়েছিল, সে আসলে তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল-ঠিক আছে, কোর্টেই দেখা হবে। তোমাদের এই জং ধরা মায়াভিলা আমি মাটির সাথে মিশিয়ে দেব।

অদীপ্ত চলে যাওয়ার পর নীলা মাটিতে বসে পড়ল। তার শরীর কাঁপছে। অনিমেষ বাবু গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি দেখলেন, নীলার হাতের ক্ষতটা খুব একটা গভীর নয়, কিন্তু তার চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছে।

Mukto Vabuk
Anything Talented Works

অনিমেষ বাবু কানে কানে বললেন–

"তুই কেন নিজের ক্ষতি করলি রে মা?"

নীলা ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, "ওরা দিদার গাছটা কেটে ফেলত দাদু। বাবা বলতেন, শিল্পীরা মরে গেলে

গাছ হয়ে বেঁচে থাকে। এই শিউলি গাছটা তো শুধু গাছ নয়, এটা দিদার আত্মা।“

সেদিন রাতে অনিমেষ বাবু তাঁর ডায়েরিতে একটি বিশেষ উক্তি লিখলেন যা তাঁর জীবনের নতুন দর্শন হয়ে দাঁড়াল–

মানুষের লোভ যখন শিল্পের ওপর আঘাত হানে, তখন সেই আঘাত ফিরিয়ে দেওয়ার শক্তি প্রকৃতিই জোগায়। মরিচা লোহার ক্ষয় করতে পারে, কিন্তু প্রাণের শিকড় উপড়ে ফেলার সাধ্য তার নেই।

মধ্যরাতে অনিমেষ বাবু শুনতে পেলেন মায়াভিলার পুরনো স্টোররুম থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ আসছে। কেউ যেন খুব সাবধানে পুরনো ট্রাঙ্কগুলো ঘাঁটছে। তিনি টর্চ নিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। দরজাটা আধখোলা। ভেতরে আলো ফেলতেই তিনি যা দেখলেন, তাতে তাঁর রক্ত হিম হয়ে গেল।

নীলা সেখানে নেই। কিন্তু সেখানে বসে আছে অন্য এক নারী মূর্তী, যার অবয়ব হুবহু সুলতার মতো! আলো পড়তেই সে ছায়ার মতো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। অনিমেষ বাবুর হাত থেকে টর্চটা পড়ে গেল। এটা কি

মনের ভুল? নাকি মায়াভিলার দেয়ালে আজও সুলতা জেগে আছেন?

মায়াভিলার রহস্য এখন এক নতুন দিকে মোড় নিল। সুলতার সেই ১২টি ক্যানভাসে আর কী কী লুকিয়ে আছে? আর কে সেই ছায়ামূর্তি যে মাঝরাতে মায়াভিলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে?

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

সপ্তম অধ্যায়

অয়নের প্রবেশ

মায়াভিলার করিডোরে রাতের সেই রহস্যময় ছায়ামূর্তির রেশ এখনো কাটেনি। অনিমেষ চৌধুরী সারারাত ঘুমাতে পারেননি। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা সত্ত্বেও তাঁর ইন্দ্রিয়গুলো এখন প্রখর হয়ে উঠেছে। ড্রয়িংরুমের মেঝেতে পড়ে থাকা টর্চটা সকালেই কুড়িয়ে নিলেন নীলা। তার মুখে এক অদ্ভুত প্রশান্তি, যেন রাতে কিছুই ঘটেনি। কিন্তু অনিমেষ বাবুর মনে খটকা রয়েই গেল। তিনি কি সত্যিই সুলতাকে দেখেছিলেন? নাকি ১০ বছরের একাকীত্ব তাঁর মস্তিষ্কে কোনো বিভ্রম তৈরি করছে?

সকাল দশটা নাগাদ অয়ন এল একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে। তার হাতে কয়েকটা আইনি নথি। সে সোজা স্টোররুমে গিয়ে সুলতার সেই ১২টি ক্যানভাস নিয়ে বসাল। অয়ন বলল–

অনিমেষ বাবু, অদীপ্ত সাহেব এবার খুব নোংরা চাল চালছেন। তিনি দাবি করেছেন যে, নীলার বাবা অবিনাশ সেন আসলে সুলতা দেবীর থেকে কয়েক লক্ষ

টাকা ধার নিয়েছিলেন যা কোনোদিন শোধ করা হয়নি। তাঁর দাবি, এই বাড়িটা আসলে ঋণের দায়ে সুলতা দেবী অবিনাশের নামে লিখে দিতে চেয়েছিলেন বলে যে গল্পটা আপনারা বলছেন, তা মিথ্যে। বরং অবিনাশ সেন জালিয়াতি করে দিদার সই নকল করেছেন।

অনিমেষ বাবু সোফায় ধপ করে বসে পড়লেন।

“অবিনাশ টাকা ধার নিয়েছিল? অসম্ভব! সে অভাবী হতে পারে, কিন্তু চোর ছিল না।“

নীলা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। সে হঠাৎ করে সুলতার পঞ্চম নম্বর ক্যানভাসটা অয়নের সামনে এনে রাখল। এই ছবিতে মায়াভিলার রান্নাঘরের এক কোণে রাখা একটা পুরনো পিতলের সিন্দুক আঁকা আছে।

নীলা বলল–

“অয়ন দা, এই ছবিটা ভালো করে দেখুন।

দিদা এই সিন্দুকটার ওপর একটা নম্বর লিখেছেন– ৪২–০৭–৮৯। এটা কোনো তারিখ নয়, এটা একটা ভল্টের নম্বর।

অয়ন চমকে উঠে বলল–ভল্টের নম্বর মানে? আমাদের কি সেই সিন্দুকটা খুঁজতে হবে?

পুরো মায়াভিলায় তোলপাড় শুরু হলো। রান্নাঘরের সেই অন্ধকার কোণে, যেখানে মাটির নিচে সিন্দুকটা থাকার কথা, সেখানে এখন শুধু একরাশ ঝুল আর জং ধরা পুরনো আসবাব। কিন্তু নীলা দমার পাত্র নয়। সে হাত দিয়ে দেয়াল ঠুকে ঠুকে শব্দ শুনতে লাগল। হঠাত ইটের খাঁজে একটা ফাঁপা শব্দ পাওয়া গেল। চিমনিটার ঠিক নিচে একটি আলগা ইট সরাতেই বেরিয়ে এল সেই পিতলের ছোট সিন্দুক।

সিন্দুকটা যখন খোলা হলো, অনিমেষ বাবুর চোখ ছানাবড়া। ভেতরে কোনো সোনাদানা নেই, আছে এক

তাড়া পুরনো ব্যাংক স্টেটমেন্ট আর একটা হাতে লেখা রসিদ। ১৯ বছর আগের রসিদ। যেখানে স্পষ্ট লেখা আছে–

“আমি অবিনাশ সেন, সুলতা চৌধুরীর দেওয়া ৫ লক্ষ টাকা আজ গ্রহণ করলাম। এই টাকা আমার চিকিৎসার জন্য নয়, বরং মায়াভিলার গচ্ছিত ঋণ শোধ করার জন্য।“

অনিমেষ বাবু কাঁপা হাতে কাগজটা পড়লেন।
“মায়াভিলার ঋণ শোধ করার জন্য? তার মানে কি এই বাড়িটা একসময় ব্যাংকে বন্ধক ছিল?”

ডক্টর চ্যাটার্জি দুপুরে হঠাত না বলেই মায়াভিলায় ঢুকলেন। তাঁর হাতে একটা পুরনো মেডিকেল রিপোর্ট। তিনি বললেন–অনিমেষ, আমি আজ কিছু বলতে এসেছি যা সুলতা আমায় বলতে বারণ করেছিলেন। ১৯ বছর আগে যখন তোমার পেনশনের টাকা আটকে গিয়েছিল আর অদীপ্ত বিদেশের পড়াশোনার জন্য টাকা চাইছিল, তখন তুমি বাড়িটা বন্ধক দিয়েছিলে। তুমি ভেবেছিলে তুমি শোধ করে দেবে, কিন্তু পারোনি। সুলতা তখন

তাঁর নিজের জমানো সব টাকা আর অবিনাশের সাহায্য নিয়ে ওই বাড়িটা ব্যাংকের থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন। অবিনাশ তাঁর নিজের পৈতৃক বাড়ি বিক্রি করে সেই টাকা সুলতাকে দিয়েছিলেন শুধু মায়াভিলা বাঁচানোর জন্য। কারণ তিনি জানতেন, তোমার কাছে এই বাড়িটা তোমার মন্দির।“

অনিমেষ বাবু দুই হাতে মুখ ঢাকলেন। তাঁর অজান্তেই কত বড় নাটক মঞ্চস্থ হয়ে গেছে তাঁর এই সংসারে! সুলতা আর অবিনাশ মিলে তাঁকে একটি দিনের জন্যও বুঝতে দেননি যে তিনি তাঁর সর্বস্ব হারাতে বসেছিলেন। আর আজ সেই অবিনাশের মেয়েকেই অদীপ্ত চোর বলছে?

নীলার চোখে তখন জল। সে বলল–

বাবা সারাজীবন এই ঋণটা বয়ে বেড়িয়েছেন দাদু। তিনি যখন মারা যান, তখন তাঁর হাতে কোনো পয়সা ছিল না। তিনি বলতেন– নীলা, মায়াভিলা বেঁচে থাকলেই আমার শিল্প বেঁচে থাকবে। আজ আমি বুঝতে পারছি কেন দিদা তাঁর উইলে বাবার নাম লিখে

গিয়েছিলেন। তিনি আসলে বাবার ত্যাগকে মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন।

ঠিক তখনই অদীপ্ত আর তার উকিল মায়াভিলার দরজায় ধাক্কা দিল। অদীপ্ত এবার জয়ের হাসিতে ডগমগ। “বাবা, কোর্ট থেকে ইনজাংশন নিয়ে এসেছি। এই মুহূর্ত থেকে বাড়ির কোনো আসবাব বা ছবি সরানো যাবে না। আর নীলা, তোমাকে পুলিশ ডাকছি জালিয়াতির অভিযোগে।“

অয়ন তখন পকেট থেকে সেই ১৯ বছর আগের রসিদ আর ব্যাংক স্টেটমেন্ট বের করে আনল। সে গম্ভীর গলায় বলল, “অদীপ্ত বাবু, পুলিশ আসবে ঠিকই, কিন্তু জালিয়াতির অভিযোগে নয়, বরং সম্পত্তি হস্তগত করার অসৎ চেষ্টার জন্য আপনাকে অ্যারেস্ট করতে। সুলতা দেবী যে সুস্থ মস্তিষ্কে ছিলেন, তার বড় প্রমাণ হলো এই সিন্দুকের হদিস দেওয়া ক্যানভাসগুলো। আর আপনার বাবার জন্য অবিনাশ সেনের এই মহানুভবতা যদি কোর্টে প্রমাণিত হয়, তবে মানহানির মামলা থেকে আপনি বাঁচবেন না।“

অদীপ্তর উকিল কাগজগুলো একবার দেখে নিয়ে অদীপ্তর কানে ফিসফিস করে কী একটা বলল। অদীপ্তর মুখ মুহূর্তেই পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। সে তো জানত না এই বাড়িতে এমন কোনো সিক্রেট সিন্দুক আছে। সে ভেবেছিল পুরনো দলিলগুলো নষ্ট করে দিলেই কাজ হয়ে যাবে।

কিন্তু গল্পের মোড় এখানেও শেষ হলো না। বিকেলে যখন বাগানবাড়িতে একটু রোদ উঠল, অনিমেষ বাবু নীলাকে একা ডেকে বললেন–

নীলা, রাতে আমি যাকে দেখেছি, সে সুলতা নয়।

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

আমি বুঝতে পারছি ওটা কে। তুই কি জানিস আমার চোখের ছানি অপারেশন হওয়ার পর আমি এখনো খুব স্পষ্ট দেখি না, কিন্তু গায়ের গন্ধ আমি চিনি।“

নীলা একটু থমকে দাঁড়াল। অনিমেষ বাবু তার দিকে তাকিয়ে বললেন–

তুই কি সত্যিই অবিনাশের মেয়ে? নাকি অন্য কেউ?

নীলার মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল। সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পকেট থেকে একটা পুরনো পেনডেন্ট বের করল, যার ভেতরে সুলতা আর এক ছোট শিশুর ছবি। শিশুর গলার তিলে একটা বিশেষ চিহ্ন আছে, যা হুবহু নীলার ঘাড়ের তিলের মতো।

নীলা ধীর গলায় বলল-দাদু, আমি অবিনাশের মেয়ে বটেই, কিন্তু আমি আপনারও কেউ হই। অবিনাশ সেন আমার জন্মদাতা বাবা নন। তিনি আমাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন এক ঝড়ের রাতে, যখন সুলতা দিদা কোনো এক কারণে আমাকে তাঁর কাছে সঁপে দিয়েছিলেন।

অনিমেষ বাবুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল।

Anything Talented Works
Works Publication

"সুলতা তোকে অবিনাশের কাছে দিয়ে এসেছিল?

কেন?"

নীলা বলল, “কারণ আমি আপনার ছেলে অদীপ্তর সন্তান নই দাদু। আমি এই বাড়ির এক গোপন অপরাধের ফসল। আমার মা ছিলেন এই মায়াভিলার এক পরিচারিকা, যাকে অদীপ্ত প্রলোভন দেখিয়েছিলেন এবং পরে অস্বীকার করেছিলেন। সুলতা দিদা সেই মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং পরে সমাজের হাত থেকে বাঁচাতে আমায় অবিনাশ বাবার কাছে দিয়ে দেন। তিনি চেয়েছিলেন আমি যেন একদিন এই মায়াভিলায় ফিরে এসে অদীপ্তর অন্যায়গুলোর বিচার করি।“

মায়াভিলার প্রতিটি দেয়ালে এখন যেন এক একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা যাচ্ছে। মরিচা ধরা জানলার ওপাশে আকাশটা রক্তিম হয়ে উঠছে। অনিমেষ বাবু আজ বুঝলেন কেন সুলতা এই বাড়িটাকে কোনো একজনের হাতে না রেখে একটা ট্রাস্টের নামে দিয়ে গেছেন। তিনি আসলে চেয়েছিলেন এই ‘পাপের’ প্রায়শ্চিত্ত করতে।

অনিমেষ বাবু কাঁপাকাঁপা হাত দিয়ে নীলার মাথায় হাত রাখলেন। আজ তাঁর কাছে সব পরিষ্কার। অদীপ্ত তাঁর ছেলে হতে পারে, কিন্তু সে কুসন্তান। আর নীলা যে আসলে তাঁরই রক্তের অংশ, সে হয়ে এসেছে তাঁর ত্রাণকর্তা।

তিনি ডায়েরিতে শেষ পাতায় বড় বড় অক্ষরে লিখলেন–

“রক্তের চেয়েও বড় হলো সম্পর্কের সত্য। জং ধরা মায়াভিলা আজ এক নতুন পবিত্রতার স্নান করল। অদীপ্তর পতন অবধারিত, কারণ সত্যের ক্যানভাসে মিথ্যের রঙ কখনো স্থায়ী হয় না।”

কিন্তু রাত ঘনিয়ে আসতেই এক নতুন বিপদ দেখা দিল। অদীপ্ত যখন বুঝতে পারল সে আইনি পথে হারছে, তখন সে অন্য এক পথ বেছে নিল। মধ্যরাতে মায়াভিলার বাগানে হঠাত কেরোসিনের গন্ধ পাওয়া গেল। অদীপ্ত কি তবে নিজের হাতে পুড়িয়ে দেবে এই ‘মরিচায় বোনা মহাকাব্য’?

মুক্তভাবুক

অষ্টম অধ্যায়

অগ্নিপরীক্ষা

রাত তখন প্রায় আড়াইটে। মায়াভিলার চারপাশটা এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা। শীতের আমেজ শুরু হওয়ায় বাইরের ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকটাও আজ কেমন করুণ শোনাচ্ছে। অনিমেষ চৌধুরী তাঁর ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন, কিন্তু ঘুমের ঘোরেও তিনি এক অস্বস্তিকর গন্ধ পাচ্ছিলেন। নাক জ্বলে যাওয়া সেই গন্ধটা ঠিক ফুলের নয়, বৃষ্টিরও নয় ওটা ছিল দাহ্য কোনো পদার্থের। পোড়া তেলের একটা তীব্র গন্ধে তাঁর তন্দ্রা টুটে গেল।

চোখ মেলেই তিনি দেখলেন, জানলার ওপাশে একটা রক্তিম আভা দাউদাউ করে নাচছে। প্রথমে ভাবলেন হয়তো ভোরের সূর্য উঠছে, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে পড়ল সূর্য তো উল্টো দিক থেকে ওঠে। তিনি টলমল পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন এবং যা দেখলেন তাতে তাঁর রক্ত হিম হয়ে গেল।

মায়াভিলার সেই শিউলি বাগানটা দাউদাউ করে জ্বলছে! যে গাছটাকে সুলতা নিজের হাতে বড় করেছিলেন, তার

সবুজ পাতাগুলো আগুনের লেলিহান শিখায় কুঁকড়ে কালো হয়ে যাচ্ছে। আগুনের তীব্রতা এতটাই যে, বারান্দায় দাঁড়িয়েও আগুনের আঁচ অনিমেষ বাবুর মুখে লাগছে। ঠিক তখনই তিনি দেখলেন, বাগানের অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তী হাতে একটি খালি ড্রাম নিয়ে দ্রুত গেটের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। সেই হাঁটার ভঙ্গিটা অনিমেষ বাবুর অতি পরিচিত-সে অদীপ্ত!

অনিমেষ বাবু চিৎকার করে ডাকতে চাইলেন, কিন্তু বুক ফেটে কান্না এলেও গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না। তিনি দেখলেন, অদীপ্ত যখন বুঝতে পেরেছে যে আইনি পথে সে হারছে, তখন সে মায়াভিলাকে ছাই করে দেওয়ার শপথ নিয়েছে। তার কাছে এই বাড়ি এখন আর কোনো সম্পত্তি নয়, বরং তার হারের এক অপমানজনক দলিল।

“নীলা! নীলা!”- অবশেষে অনিমেষ বাবুর গলা দিয়ে আর্তনাদ বের হলো।

নীলা পাশের ঘরেই ছিল। আগুনের শব্দে সে আগেই জেগে গিয়েছিল। সে দ্রুত দৌড়ে এসে অনিমেষ বাবুকে

জড়িয়ে ধরল। দাদু, আপনি নিচে নামবেন না!
আগুনের শিখা মেইন গেটের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।
অদীপ্ত বাবু নিচতলার সিঁড়িতেও তেল ঢেলে দিয়েছেন।

মায়াভিলা এক জীর্ণ পুরনো দালান। কড়িকাঠ আর কাঠের জানলাগুলো মুহূর্তের মধ্যে আগুন ধরে নিল। এক সময়ের রাজকীয় মায়াভিলা এখন এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড। নীলা বুঝতে পারল, শুধু নিজেদের বাঁচানোই বড় কথা নয়, এই বাড়ির ভেতর থাকা সুলতার সেই ১২টি ক্যানভাস আর পুরনো নথিপত্রগুলো বাঁচানো জরুরি। কারণ ওগুলোই হলো অদীপ্তর অপরাধের প্রমাণ।

নীলা বাথরুমে গিয়ে একটা চাদর ভিজিয়ে নিয়ে এল। সেটা অনিমেষ বাবুর গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বলল–

“দাদু, আপনি ছাদের দিকে যান। আমি স্টোররুম থেকে ক্যানভাসগুলো নিয়ে আসছি।“

অনিমেষ বাবু পাগলের মতো নীলার হাত ধরলেন। “না রে মা, তুই যাস না! বাড়ি ভেঙে পড়বে। সব পুড়ে যাক, তুই বেঁচে থাক!”

নীলা এক মুহূর্তের জন্য অনিমেষ বাবুর চোখের দিকে তাকাল। তার চোখে তখন কোনো ভয় ছিল না, ছিল এক অমোঘ জেদ। সে ধীর গলায় বলল–

দাদু, মরিচা পুড়লে তবেই তো খাঁটি লোহা বেরিয়ে আসে। এই আগুনেই অদীপ্তর সব পাপ শেষ হবে। আপনি যান, আমি আসছি।

নীলা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। অনিমেষ বাবু খুব কষ্টে ছাদের দিকে সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ যেন এক একটা যুগের বোঝা। নিচে থেকে আগুনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, আর শোনা যাচ্ছে পুরনো আসবাবপত্রের হাড় মড়মড় করে ভেঙে পড়ার শব্দ। মায়াভিলার যে দেয়ালে তিনি রঙের জাদু দেখাতেন, সেই দেয়াল এখন কালচে ধোঁয়ায় অভিশপ্ত হয়ে উঠছে।

নিচে তখন অন্য এক নাটক চলছে। অদীপ্ত গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছিল মায়াভিলার বিনাশ। সে

ভাবছিল, সব প্রমাণ যদি পুড়ে যায়, তবে সে কোর্টে বলতে পারবে এক এক্সিডেন্টে বাড়িটি ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু ঠিক তখনই পাড়ার মানুষ আর অয়ন সেখানে এসে উপস্থিত হলো। অয়ন দূর থেকে দেখেই ফায়ার সার্ভিসকে ফোন দিয়েছিল।

অদীপ্ত পালানোর চেষ্টা করতেই অয়ন তাকে জাপটে ধরল। কোথায় পালাবেন অদীপ্ত বাবু? আপনার হাতে কেরোসিনের গন্ধ আর আপনার সিসিটিভি ফুটেজ পাশের বাড়ির ক্যামেরাগুলোতে ধরা পড়ে গেছে।

অদীপ্ত রাগে উন্মত্ত হয়ে অয়নকে মারতে শুরু করল, কিন্তু এলাকার যুবকরা তাকে ঘিরে ধরল। ঠিক এই সময় মায়াভিলার ছাদের রেলিংয়ে অনিমেষ বাবুকে দেখা গেল। তাঁর চারদিকে ধোঁয়া আর আগুনের শিখা। সবাই নিচ থেকে চিৎকার করতে লাগল। কিন্তু নীলা কোথায়?

মিনিট পাঁচেক পর, যখন সবার মনে হচ্ছিল নীলা আর বেঁচে নেই, ঠিক তখনই দোতলার একটা জানলা ভেঙে নীলা বেরিয়ে এল। তার এক হাত দড়িতে ঝুলছে, আর পিঠে বাঁধা সেই কাপড়ের থলে যার ভেতর সুলতার

১২টি ক্যানভাস। তার গায়ের জামা জায়গায় জায়গায় পুড়ে গেছে, মুখটা ধোঁয়ায় কালো। সে এক অতিমানবিক শক্তিতে দড়ি বেয়ে নিচে নামল এবং ড্রেনে জমে থাকা বালু দিয়ে নিজের শরীরের আগুন নেভালো।

ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি তখন সাইরেন বাজাতে বাজাতে এসে পৌঁছেছে। অনেক কষ্টের পর আগুন যখন আয়ত্তে এল, তখন ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। মায়াভিলা এখন আর সেই মায়াবী বাড়ি নেই। পুরো সাদা দালানটা এখন এক বিচ্ছিরি কালো কঙ্কাল। ছাদের একাংশ ভেঙে পড়েছে।

অনিমেষ বাবুকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা নামিয়ে আনল। তিনি নিচে নেমেই পাগলের মতো নীলার কাছে ছুটে গেলেন। নীলা তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। তার পিঠের থলেটা অক্ষত। সে কাঁপাকাঁপা হাতে ব্যাগটা অনিমেষ বাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল–

“দাদু... আপনার.. আপনার মহাকাব্য আমি মরতে দিইনি।“

অনিমেষ বাবু নীলাকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর সারা জীবনের কান্না যেন আজ উথলে উঠল। তিনি দেখলেন অদীপ্তকে পুলিশ হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অদীপ্ত একবারও বাবার চোখের দিকে তাকাতে পারল না। তার মাথা নিচু হয়ে গেছে।

সকাল হওয়ার পর দেখা গেল মায়াভিলার বাইরের দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে থাকলেও ভেতরের সব শেষ। কিন্তু অদ্ভুত এক দৃশ্য চোখে পড়ল। সেই শিউলি গাছটার ওপরের ডালগুলো পুড়ে গেলেও তার একদম গোড়ার দিকে একটা ছোট্ট কচি পাতা তখনও অক্ষত। আগুন যেন সবটুকু প্রাণ কেড়ে নিতে পারেনি।

অয়ন পাশে এসে দাঁড়াল। সে বলল, “অনিমেষ বাবু, অদীপ্তর বিরুদ্ধে এখন খুনের চেষ্টা আর জালিয়াতির স্ট্রং কেস হবে। এই ক্যানভাসগুলো আর ক্যাসেট রেকর্ডারটা আমাদের সব প্রমাণ দিয়ে দেবে।“

কিন্তু অনিমেষ চৌধুরী এসব শুনছিলেন না। তিনি পোড়া মায়াভিলার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, এই আগুনটা দরকার ছিল। ১০

বছরের যে শোকের স্তূপ আর অবহেলার জং এই বাড়িটাকে আঁকড়ে ছিল, তা আজ পুড়ে সাফ হয়ে গেছে।

নীলার চিকিৎসা হলো। কয়েক দিন পর যখন সে একটু সুস্থ হলো, তখন অনিমেষ বাবু তাকে ডেকে বললেন, “নীলা, অদীপ্তর শাস্তি হবে সেটা আমি জানি। কিন্তু মায়াভিলার তো আর কিছু রইল না। এখন আমরা কোথায় যাব?”

নীলা একটা ম্লান হাসি হাসল। সে তার ব্যাগের ভেতর থেকে একটা ছোট ডায়েরি বের করল। ওটা সুলতার ডায়েরি নয়, ওটা নীলার বাবা অবিনাশের। অবিনাশ সেখানে লিখেছিলেন–

“যদি কখনো মায়াভিলা ধ্বংস হয়, তবে জানবে তার মাটির নিচে এক গুপ্ত ধন লুকানো আছে, যা কোনো অর্থ নয়, বরং শিল্পের এক মহাপীঠ।“

অনিমেষ বাবু প্রশ্ন করলেন, “তার মানে?”

নীলা বলল, “মায়াভিলার মাটির নিচে সুলতা দিদা আর বাবা মিলে এমন কিছু একটা তৈরি করেছেন যা আগুন ছুঁতে পারেনি। চলুন দাদু, আজ আমরা সেই পাতালঘরের রহস্য উন্মোচন করব।“

মায়াভিলার ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে কি তবে বেরিয়ে আসবে এক নতুন জীবনের উৎস? অদীপ্তর কারাবাস কি এই মহাকাব্যের শেষ নাকি নতুন কোনো রহস্যের শুরু?

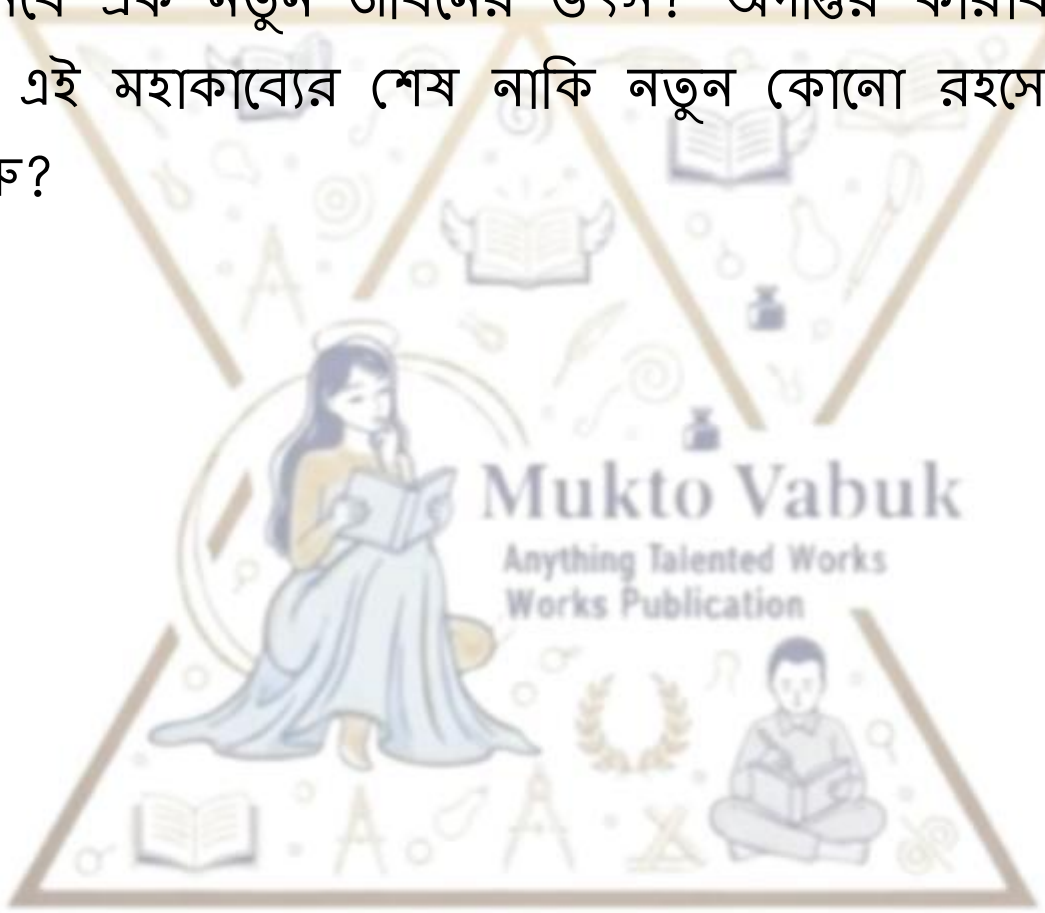

নবম অধ্যায়

পাতালঘরের সন্ধানে

মায়াভিলার পুড়ে যাওয়া কঙ্কালসার দালানটার ওপর যখন ভোরের আলো পড়ল, তখন এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা চারপাশকে ঘিরে রেখেছে। আগুনের পোড়া গন্ধটা এখনো বাতাসে ভাসছে, যা স্মৃতি আর শোকের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। পাড়ার কৌতুহলী মানুষরা ভিড় করেছিল ঠিকই, কিন্তু ধ্বংসস্তূপের গম্ভীর রূপ দেখে তারা আর ভেতরে ঢোকার সাহস পায়নি।

অনিমেষ চৌধুরী বারান্দার একটা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতের ছাপ বসছে সেই কালচে পোড়া দেয়ালে। তিনি ভাবছেন অদীপ্ত যাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, সেই ধ্বংসের ভেতর থেকেই কি তবে পুনর্জন্ম সম্ভব?

নীলা ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত নিয়ে ধ্বংসস্তূপের ভেতর এদিক-সেদিক খুঁজছিল। তার চোখে ক্লান্তি নেই, আছে এক অস্বাভাবিক তেজ। সে অবিনাশের ডায়েরির সেই

নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাটা বারবার দেখছিল। সেখানে একটা সংকেত ছিল–

“যেখানে রোদ পড়ে না, সেখানেই আসল আলো লুকিয়ে থাকে।“

অনিমেষ বাবু ধীর গলায় বললেন–

নীলা, তুই কি সত্যিই বিশ্বাস করিস এই ধ্বংসের নিচে কোনো গুপ্ত পথ আছে? সুলতা বা অবিনাশ কি সত্যিই এমন কিছু করতে পারে?

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

নীলা ম্লান হেসে বলল–

দাদু, সুলতা দিদা জানতেন যে একদিন এই বাড়িটার ওপর আঘাত আসতে পারে। তাই তিনি আর বাবা মিলে মায়াভিলার একদম মূল ভিত্তিপ্রস্তরের নিচে একটা ছোট ঘর তৈরি করেছিলেন। বাইরে থেকে যেটা ছিল

শুধুই এক পরিত্যক্ত স্টোররুমের মেঝের নিচ, আসলে সেটাই ছিল তাঁদের শিল্পের নিরাপদ আশ্রয়।

মায়াভিলার সেই পোড়া স্টোররুমের মেঝেতে তখন ছাই আর পোড়া কাঠের পাহাড়। অয়ন আর এলাকার কয়েকজন যুবক মিলে সেই আবর্জনা সরাতে শুরু করল। কয়েক ঘন্টা হাড়ভাঙা খাটুনির পর মেঝের একটা কোণে একটা বড় লোহার কড়া খুঁজে পাওয়া গেল। কড়াটা এতটাই ভারী আর জং ধরা যে, চার-পাঁচজন মিলেও সেটা তুলতে ঘাম ঝরিয়ে ফেলল।

অবশেষে এক বিকট শব্দে সেই ডালাটা খুলে গেল। নিচে এক অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ। টর্চের আলো ফেলতেই দেখা গেল সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। অনিমেষ বাবুর বুকটা ধড়াস করে উঠল। তিনি কি প্রস্তুত তাঁর অতীতের এই নতুন অধ্যায়ের মুখোমুখি হতে?

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতেই এক ভ্যাপসা কিন্তু প্রাচীন চন্দন কাঠের গন্ধ নাকে এল। ঘরটা খুব একটা বড় নয়, কিন্তু সেখানে যা সাজানো আছে তা দেখে অনিমেষ বাবুর নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো।

চারদিকের দেয়ালে সারিবদ্ধভাবে রাখা আছে তাঁর নিজের আঁকা কয়েকশো ছবি! যে ছবিগুলো তিনি ভেবেছিলেন হারিয়ে গেছে বা উইপোকা নষ্ট করে ফেলেছে, সেগুলো এখানে কাঁচের আবরণে সুরক্ষিত। শুধু তাই নয়, ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা বেদির ওপর রাখা আছে সুলতার একটি মস্ত বড় পোট্রেট। সেই পোট্রেটের নিচে একটা ছোট চিরকুট রাখা।

অনিমেষ বাবু কাঁপাকাঁপা হাতে চিরকুটটা তুললেন। সুলতার হাতের লেখা–

“অনিমেষ, শিল্প কোনোদিন জং ধরে শেষ হয় না। লোকে ভেবেছে আমাদের বাগান শুকিয়ে গেছে, কিন্তু আমি আর অবিনাশ তোমার শ্রেষ্ঠ কাজগুলোকে মাটির নিচে সযতনে তুলে রেখেছি। অদীপ্ত যদি মায়াভিলা জ্বালিয়েও দেয়, তবু এই মাটির নিচের শিল্পভাণ্ডার থাকবে অক্ষত। এটা তোমার পুনর্জন্মের সিড়ি।“

অনিমেষ বাবু পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি এতদিন নিজেকে এক নিঃস্ব বৃদ্ধ ভেবেছিলেন, অথচ

তাঁর অজান্তেই তিনি ছিলেন এক বিশাল অমূল্য সম্পদের মালিক। অবিনাশ আর সুলতা মিলে এই পাতালঘরটিকে একটি আধুনিক আর্কিভ বা সংগ্রহশালা হিসেবে তৈরি করেছেন।

নীলা একটা শেলফের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে একটা ট্রাঙ্কের ওপর নীল কাপড়ে ঢাকা কিছু একটা ছিল। কাপড়টা সরাতেই দেখা গেল একটা রুপোর ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। ছবিতে এক ছোট শিশু আর তার পাশে সুলতা। কিন্তু এই ছবির নিচে লেখা নামটি দেখে নীলা আর অনিমেষ বাবু-দুজনেই চমকে উঠলেন।

সেখানে লেখা ছিল-

"আমাদের উত্তরসূরি, অরুণিমা।"

অনিমেষ বাবু অবাক হয়ে নীলার দিকে তাকালেন।

"অরুণিমা? সে কে?"

নীলা তার গলার সেই পেনডেন্টটা আর ছবির শিশুর গলার চিহ্নটা মেলাতে লাগল। তার চোখ দিয়ে তখন অঝোরে জল পড়ছে। সে ফিসফিস করে বলল:-

দাদু, আমার আসল নাম তবে অরুণিমা? কিন্তু আমার মা কে? সুলতা দিদা আমাকে অবিনাশ বাবার কাছে দিয়ে আসার সময় আমার আসল পরিচয় কি গোপন রেখেছিলেন?

ঠিক তখনই পাতালঘরের এক অন্ধকার কোণ থেকে একটা ছায়া বেরিয়ে এল। সেই রহস্যময়ী নারী, যাকে অনিমেষ বাবু আগে দুইবার দেখেছিলেন। আলো পড়তেই দেখা গেল–সে এক মধ্যবয়সী মহিলা, যার চোখেমুখে গভীর বিষাদ আর মায়াভিলার প্রতিটি ইটের গল্প যেন লেখা।

মহিলাটি নীলার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দুচোখ বেয়ে জল ঝরছে। তিনি কাঁপাকাঁপা গলায় বললেন, “অরুণিমা... আমার মেয়ে!”

অনিমেষ বাবু চিৎকার করে উঠলেন, “কে আপনি?”

মহিলাটি ধীর গলায় বললেন, “আমি সুলতার ছোট বোন, মল্লিকা। যাকে আপনারা ভেবেছিলেন মারা গেছে। অদীপ্তর অন্যায়ের সাক্ষী হওয়ার অপরাধে আমাকে এই বাড়ি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুলতা দিদিই আমাকে এই পাতালঘরে এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলেন আর মাঝেমধ্যে খাবার দিয়ে যেতেন। আমিই সেই ছায়ামূর্তি, যে রাতের অন্ধকারে এই মায়াভিলার পাহারাদার হয়ে বেঁচে ছিলাম।“

মায়াভিলার রহস্যের জট এখন আরও জটিল হয়ে উঠল। নীলা কি তবে অদীপ্তর সন্তান নয়, বরং এই বাড়ির এক নিষিদ্ধ সত্যের অংশ? অদীপ্ত কি জানত তার মাসি মল্লিকা বেঁচে আছে?

বাইরে তখন পুলিশের গাড়ির সাইরেন শোনা যাচ্ছে। অদীপ্তর বিরুদ্ধে আরও নতুন অভিযোগ আসতে শুরু করেছে। কিন্তু মায়াভিলার এই অন্ধকার ঘরে আজ যা প্রকাশ পেল, তা কোনো মহাকাব্যের চেয়ে কম নয়।

অনিমেষ বাবু ডায়েরির নতুন পাতায় লিখলেন–

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

“ধ্বংসের নিচে শুধু ছাই থাকে না, কখনো কখনো চাপা পড়া সত্যের বীজও থাকে। মায়াভিলা আজ মুক্তি পেল।“

কিন্তু মল্লিকার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি আরও বড় কোনো বিপদের কথা বলতে চান। তিনি নীলার হাত ধরে বললেন, “অরুণিমা, আমাদের এখনই এখান থেকে বেরোতে হবে। অদীপ্ত জেলে গেলেও তার সাঙ্গপাঙ্গরা এই পাতালঘরের খবর জানে। তারা এই শিল্প সম্পদ লুট করতে আসবে।“

আবারও কি এক নতুন সংগ্রামের মুখে মায়াভিলার উত্তরাধিকারীরা? নীলার আসল বাবার পরিচয় কি তবে আরও ভয়ংকর কিছু?

Mukto Vabuk
Works Publication

দশম অধ্যায়

মল্লিকার মুক্তি

মায়াভিলার পাতালঘরের স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে টর্চের আলোটা যখন মল্লিকার ফ্যাকাশে মুখের ওপর পড়ল, তখন মনে হলো সময় যেন কয়েক দশকের জন্য থমকে গেছে। অনিমেষ চৌধুরীর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই নারী তাঁর শ্যালিকা মল্লিকা যাকে পুরো পরিবার জানত কোনো এক দুর্ঘটনায় হারিয়ে গেছে। তাঁর বেঁচে থাকাটা যেমন বিস্ময়কর, এই অন্ধকার ঘরে এতদিন বন্দি থাকাটা তার চেয়েও বেশি যন্ত্রণাদায়ক।

নীলা ওরফে অরুণিমা স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে ছিল। তার সারা শরীর কাঁপছে। যাকে সে এতদিন 'সুলতা দিদা' বলে জেনেছে, তিনি আসলে তার আপন বড় মাসি? আর এই যে নারীটি সামনে দাঁড়িয়ে 'মা' বলে ডাকছে, তাঁর চোখের অতলান্ত বিষাদ কি সত্যিই সত্য?

মল্লিকা ধীর পায়ে এগিয়ে এসে নীলার হাত দুটো ধরলেন। তাঁর হাতের চামড়া খসখসে, নখগুলো ক্ষয়ে গেছে যেন বছরের পর বছর মাটির নিচের দেয়াল আঁচড়েছেন তিনি। মল্লিকা বলতে শুরু করলেন–

"অনিমেষ দা, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি জানি আপনি ভেবেছিলেন আমি নিরুদ্দেশ। কিন্তু অদীপ্ত... আপনার ছেলে অদীপ্ত আমাকে এই ঘরের অন্ধকারে আটকে রেখেছিল। সে জানত, আমি যদি বাইরে থাকি, তবে সুলতা দিদির করা সব পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাবে।"

Mukto Vabuk
Anything talented Works
Works Publication

অনিমেষ বাবু স্তব্ধ গলায় বললেন–
অদীপ্ত এটা করতে পারল?
কিন্তু সুলতা তোকে খাবার দিয়ে যেত বললি, সে কেন আমায় কিছু বলেনি?
মল্লিকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাথরের দেয়ালে হেলান দিলেন। "দিদি অপারগ ছিল। অদীপ্ত দিদিকে হুমকি দিয়েছিল যে আমি যদি বাইরে

আসি, তবে সে আপনার হার্টের ওষুধ বদলে দেবে। আপনাকে তিলে তিলে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে দিদিকে চুপ করিয়ে রেখেছিল সে। দিদি মাঝরাতে যখন নামাজ পড়ার বা প্রার্থনার নাম করে নিচে নামতেন, তখন আসলে তিনি আমার কাছে আসতেন। আমরা দুজনে মিলে এই পাতালঘরটিকে আপনার ছবির গ্যালারি বানিয়েছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম অদীপ্ত মায়াভিলা বিক্রি করে দিলেও আপনার শ্রেষ্ঠ কাজগুলো যেন নিরাপদ থাকে।"

নীলা এবার ডুকরে কেঁদে উঠল। "তাহলে আমার বাবা কে মা? অদীপ্ত কি আমার..."

মল্লিকা মাথা নিচু করলেন। চোখের জল টপটপ করে মাটির ওপর পড়তে লাগল। "না অরুণিমা। অদীপ্ত তোর বাবা নয়। অদীপ্ত যখন আমার ওপর অত্যাচার করতে চেয়েছিল, তখন সুলতা দিদি আমাকে বাঁচানোর জন্য এই বাড়ির এক বিশ্বস্ত মানুষ, যে ছিল অবিনাশ তার হাতে

আমাকে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, অদীপ্ত আমাকে অপহরণ করে আটকে রাখে। তুই জন্মেছিলি এই অন্ধকার ঘরেই। দিদি তোকে আগলে রেখেছিলেন এবং পরে সুযোগ বুঝে অবিনাশের হাতে তুলে দেন যাতে তুই অন্তত বাইরের আলো দেখতে পাস।"

অনিমেষ বাবু রাগে আর ঘৃণায় দেয়ালে একটা ঘুষি মারলেন। তাঁর নিজের সন্তান এত বড় পিশাচ হতে পারে, তা তিনি কোনোদিন কল্পনা করেননি। মায়াভিলার এই মরিচা ধরা ঐতিহ্যের পেছনে যে এতটা রক্ত আর চোখের জল মিশে আছে, তা আজ প্রলয়ঙ্করী আগুনের চেয়েও বেশি দহন করছে তাঁকে।

হঠাৎ ওপরের ধ্বংসস্তূপ থেকে ভারি বুটের শব্দ শোনা গেল। ডক্টর চ্যাটার্জি আর অয়ন ওপর থেকে চিৎকার করে উঠলেন, "নীলা! অনিমেষ বাবু! আপনারা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসুন! পুলিশ জানতে পেরেছে অদীপ্তর কিছু লোক পেছনের পাঁচিল দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। ওরা ওই পাতালঘরের খবর কোনোভাবে জেনে গেছে!"

মল্লিকা আঁতকে উঠলেন। "ওরা এসেছে! অদীপ্ত জেলে গেলেও তার সাঙ্গপাঙ্গরা জানে এই ঘরে কোটি কোটি টাকার শিল্পকর্ম আছে। ওরা এগুলো লুট করতে এসেছে!"

অনিমেষ বাবু এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর শরীরের ক্লান্তি এক নিমেষে উধাও হয়ে গেল। তিনি দেয়ালে ঝোলানো সুলতার সেই পোট্রেটের নিচে রাখা একটা পুরনো লাঠি হাতে নিলেন। তাঁর চোখে এখন শিল্পের মায়া নেই, আছে ঘর রক্ষার তেজ।

তিনি গর্জে উঠলেন, "আজ আমি মায়াভিলার এই শেষ সম্পদ আর আমার মেয়ে-নাতনিকে কারোর হাতে সঁপে দেব না। নীলা, তুই আর মল্লিকা পেছনে ওই ছোট সুড়ঙ্গটা দিয়ে বেরোনোর চেষ্টা কর। অয়ন আছে বাইরে, ও তোদের নিয়ে যাবে।"

নীলা জেদ ধরল, "আপনাকে ছাড়া আমি কোথাও যাব না দাদু!"

"যাবি!"-অনিমেষ বাবুর কন্ঠস্বর আজ অন্যরকম। "আমি এই বাড়ির কর্তা। আমার স্ত্রী আর শ্যালিকা মিলে যে সাম্রাজ্য মাটির নিচে বুনে

গেছেন, তা রক্ষার দায়িত্ব আমার। তুই যা নীলা, তোর বেঁচে থাকা মানেই এই মায়াভিলার মহাকাব্য বেঁচে থাকা।"

নীলা আর মল্লিকা অগত্যা সেই গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে এগোতে শুরু করলেন। সুড়ঙ্গটা চলে গেছে বাগানের বাইরের পুরনো কুয়োর দিকে। অনিমেষ বাবু পাতালঘরের দরজাটা ভেতর থেকে আটকে দিলেন।

উপরে তখন ধস্তাধস্তি শুরু হয়েছে। অদীপ্তর পাঠানো গুণ্ডারা স্টোররুমের ডালাটা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে। তারা ভাবছে ভেতরে হয়তো সোনায় বাঁধানো ছবি বা হিরে-জহরত আছে।

পাতালঘরের ভেতর একা অনিমেষ বাবু। তিনি একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে সুলতার ছবির সামনে বসলেন। তাঁর মনে পড়ছে সুলতার সেই হাসি, সেই গান। তিনি তাঁর পুরনো ডায়েরিটা খুললেন। আজ আর ডায়েরিতে জং ধরা জীবনের হাহাকার নেই। তিনি লিখলেন-

"মহাকাব্যের অর্ধেক শেষ হয় বিষাদে, বাকি অর্ধেক শুরু হয় ত্যাগের রঙে। আজ মায়াভিলা তার আসল জৌলুস ফিরে পেল, কারণ সত্য আজ মাটির নিচ থেকে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়েছে।"

হঠাৎ ওপরের ডালাটা প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে পড়ল। কয়েকজন মুখোশধারী মানুষ সুড়ঙ্গ দিয়ে নিচে নেমে এল। তাদের হাতে ধারালো অস্ত্র আর টর্চ। একজন কর্কশ স্বরে বলল, "বুড়ো, সড়ে দাড়াও! সব ছবি বের করো, নইলে আজই তোমার শেষ দিন।"
অনিমেষ বাবু ম্লান হাসলেন। তিনি বললেন, "শিল্প কারো কেনা গোলাম নয় বাবা। এগুলো তোদের মতো মানুষের হাতে দেওয়ার চেয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা ভালো। কিন্তু আমি জানি, তোরা এগুলো ছুঁতেও পারবি না।"
ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরের দিক থেকে পুলিশের হুইসেল আর অয়নের চিৎকার শোনা গেল। অয়ন

আর ডক্টর চ্যাটার্জি পাড়ার লোকেদের নিয়ে পুলিশসহ মেইন গেট দিয়ে ঢুকে পড়েছেন।
নীলা আর মল্লিকা ততক্ষণে সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে গেছেন। পুলিশ ভেতরে ঢুকে গুণ্ডাদের কাবু করল।
সকালের সূর্য যখন মায়াভিলার পোড়া দালানের ওপর ঝিকিমিকি করে উঠল, তখন দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। অনিমেষ বাবুকে উদ্ধার করে বাইরে আনা হয়েছে। তিনি ক্লান্ত কিন্তু হাসছেন। তাঁর পেছনে মল্লিকা আর নীলা দাঁড়িয়ে।
মল্লিকা আজ বিশ বছর পর মায়াভিলার খোলা আকাশে সূর্য দেখছেন। নীলা তাঁর হাতটা শক্ত করে ধরে আছে।
অয়ন এগিয়ে এসে বলল–"অনিমেষ বাবু, অদীপ্তর বিরুদ্ধে এখন অপহরণ এবং নির্যাতনের নতুন মামলা হবে। সে আর কোনোদিন এই মায়াভিলার দিকে তাকাতে পারবে না।"
কিন্তু মায়াভিলার অর্ধেকটা পুড়ে গেছে। এখন কী হবে?
অনিমেষ বাবু আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মরিচা সরিয়ে লোহাকে যেমন নতুন রূপ দেওয়া

যায়, তেমনি এই ধ্বংসস্তূপের ওপরেই গড়ে উঠবে এক নতুন মহাকাব্য। মায়াভিলা হবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আর্ট মিউজিয়াম, যেখানে শিল্প থাকবে মানুষের জন্য, কোনো লোভী সন্তানের লালসার জন্য নয়।" মায়াভিলার দীর্ঘ শোকের রাত শেষ হলো।

একাদশ অধ্যায়

মরিচা ও পুনর্জন্ম

মায়াভিলার আকাশ আজ মেঘমুক্ত। আগুনের কালচে ধোঁয়া আর পোড়া গন্ধটা ধীরে ধীরে হালকা হয়ে আসছে। পোড়া দালানটার সামনে দাঁড়িয়ে অনিমেষ চৌধুরী আজ এক অন্যরকম প্রশান্তি অনুভব করছেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে নীলা থুড়ি, অরুণিমা। আর বিশ বছর পর মুক্ত পৃথিবীর আলোয় মল্লিকা যেন নিজের অস্তিত্ব ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছেন।

মল্লিকার চোখের নিচে কালচে দাগগুলো এখনো তাঁর বন্দিদশার কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে আজ এক অদ্ভুত তেজ। অয়ন আর ডক্টর চ্যাটার্জি মিলে মায়াভিলার সামনেটা পরিষ্কার করিয়েছেন। অদীপ্তর সাঙ্গপাঙ্গরা এখন শ্রীঘরে, আর অদীপ্ত নিজেও আইনি জালে এমনভাবে জড়িয়েছে যে সেখান থেকে বেরোনো প্রায় অসম্ভব।

অয়ন এগিয়ে এসে অনিমেষ বাবুকে বলল:-

দাদু, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে আর ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি থেকে লোক আসছে। পাতালঘর থেকে পাওয়া আপনার ছবিগুলো ওরা পরীক্ষা করে দেখবে। মায়াভিলাকে হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

অনিমেষ বাবু ম্লান হাসলেন। হেরিটেজ হোক বা না হোক অয়ন, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তো আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মল্লিকা ফিরে এসেছে, অরুণিমা তার মাকে খুঁজে পেয়েছে এর চেয়ে বড় শিল্প আর কী হতে পারে?

বিকেলের দিকে নীলা বাবার সেই পুরনো ট্রাঙ্কটা গুছিয়ে রাখছিল। অবিনাশ সেনের ডায়েরিটা তখনো তার হাতে। ডায়েরির একদম শেষ পাতায় একটা খাম আঠা দিয়ে লাগানো ছিল, যা আগে কারও নজরে পড়েনি। নীলা সাবধানে খামটা খুলল। ভেতরে ছিল একটা জীর্ণ চিঠি, যার হাতের লেখাটা ছিল অবিনাশের।

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

চিঠিতে লেখা ছিল:-

অরুণিমা, যখন তুই এই চিঠি পড়বি, তখন হয়তো আমি এই পৃথিবীতে থাকব না। সুলতা দিদি তোকে আমার হাতে তুলে দেওয়ার সময় একটা শর্ত দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মায়াভিলার মাটির নিচে শুধু ছবি নেই, আছে এক গোপন উইপোকা ধরা নথিপত্র। অনিমেষ বাবুর বাবা, অর্থাৎ তোর প্রপিতামহ যখন এই বাড়িটা তৈরি করেন, তখন তিনি এর ইটের ভাঁজে ভাঁজে এমন কিছু লুকিয়েছিলেন যা ধ্বংসের মুখে মায়াভিলাকে আবার জাগিয়ে তুলবে। কিন্তু মনে রাখিস, সেই সম্পদ ব্যবহারের আগে তোকে নিজেকে খাঁটি হতে হবে।

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

নীলা অবাক হয়ে চিঠিটা মল্লিকা আর অনিমেষ বাবুকে দেখাল। “ইটের ভাঁজে সম্পদ? এর মানে কী দাদু?”

অনিমেষ বাবু স্মৃতির অতলে ডুব দিলেন। তাঁর মনে পড়ল, তাঁর বাবা হিমাংশু চৌধুরী একজন দক্ষ স্থপতি ছিলেন। তিনি সবসময় বলতেন, বাড়িটা শুধু ইটের গাঁথনি নয়, এটা একটা জীবন্ত কোষ। কিন্তু ইটের ভাঁজে কী এমন থাকতে পারে?

ঠিক তখনই মায়াভিলার ভাঙা চিমনির দিক থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ এল। একটি কাঠঠোকরা পাখি অনবরত পোড়া জানলার কাঠের ওপর ঠোকরাচ্ছে। নীলা কৌতূহলী হয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। চিমনির দেয়ালটা আগুনের তাপে আলগা হয়ে গেছে। নীলা একটা হাতুড়ি দিয়ে আলতো টোকা দিতেই এক চাঙড় চুন-বালি খসে পড়ল। আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা তামার সিলিন্ডার।

সিলিন্ডারটা যখন খোলা হলো, দেখা গেল ভেতরে কতগুলো ব্লু-প্রিন্ট আর একটি ছোট চাবি। ব্লু-প্রিন্টগুলো ছিল মায়াভিলার মূল নকশা। কিন্তু নকশার পেছনে এক অদ্ভুত নির্দেশিকা ছিল।

মল্লিকা চশমাটা চোখে দিয়ে নকশাটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, অনিমেষ দা, দেখুন! এই নকশায় দেখা যাচ্ছে বাড়ির মূল প্রবেশপথের চার কোণে চারটি ছোট প্রকোষ্ঠ আছে। বাবা এগুলো বানিয়েছিলেন বাড়ির ভারসাম্য রক্ষা করতে নয়, বরং এক বিশেষ উদ্দেশ্যে। তিনি সেখানে তৎকালীন সময়ের মহামূল্যবান 'রঙের রেসিপি' এবং কিছু দামী খনিজ পিগমেন্ট লুকিয়ে

রেখেছিলেন, যা দিয়ে মহাকাব্যিক সব চিত্রকর্ম তৈরি সম্ভব।

অনিমেষ বাবু অবাক হয়ে গেলেন। সেই যুগে ছবি আঁকার প্রাকৃতিক পিগমেন্টগুলো ছিল অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এবং দামী। আজ হয়তো তার বাজারমূল্য কয়েক কোটি টাকা। কিন্তু তাঁর বাবার মতো শিল্পীর কাছে তার আসল মূল্য ছিল শিল্পের দীর্ঘস্থায়িত্বে।

অয়ন বলল:-

এটাই হবে মায়াভিলার নতুন প্রাণ। এই পিগমেন্ট ব্যবহার করে যদি আপনি আর নীলা মিলে ছবি আঁকেন, তবে মায়াভিলা আবার তার হারানো জৌলুস ফিরে পাবে। আমরা এই বাড়ির একপাশে একটা স্টুডিও আর অন্যপাশে মিউজিয়াম করব।

কিন্তু ঠিক এই সময় এক নতুন আপদ হাজির হলো। পাড়ার কতিপয় রাজনৈতিক নেতা আর প্রোমোটারের কিছু দালাল গেটের সামনে এসে ভিড় জমালো। তাদের নেতা বিশু মাতব্বর কর্কশ গলায় বলল, “অনিমেষ বাবু, বাড়ি তো পুড়ে গেছে। এখন তো আর এখানে থাকা ঠিক না। সরকার এটাকে হেরিটেজ করুক আর

যাই করুক, এলাকার উন্নতির জন্য এখানে একটা শপিং মল হওয়া দরকার। আপনি কত পাবেন বলুন, আমরা সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।“

নীলা এবার রুখে দাঁড়াল। বিশু কাকা, মায়াভিলা আগুনের হাত থেকে বেঁচে গেছে, আর এখন আপনাদের মতো শকুনদের হাত থেকেও বেঁচে যাবে। এই বাড়ি কোনোদিন বিক্রি হবে না।

বিশু হাসল। মেয়েমানুষের কথা বললে তো হবে না মা। আইনি মারপ্যাঁচ অনেক বড়। অদীপ্ত জেলে গেলেও তার পাওনাদাররা তো বসে নেই। তারা বাড়ি নিলামে তোলার চেষ্টা করবে।

অনিমেষ বাবু লাঠিটা শক্ত করে চেপে ধরলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল সেই উক্তিটি–

“মরিচা শুধু লোহার উপরিভাগ নষ্ট করে, কিন্তু তার ভেতরের শক্তিকে স্পর্শ করতে পারে না। আমাদের জীবনের ওপর যে লোভের মরিচা পড়েছে, তাকে শিল্পের তেজ দিয়েই পোড়াতে হবে।“

অনিমেষ বাবু বললেন, অয়ন, তুমি কালই ন্যাশনাল ট্রাস্টের সাথে কথা বলো। মায়াভিলার এই গোপন পিগমেন্ট আর ছবির ভাণ্ডার আমি দেশবাসীকে দান করে দিচ্ছি। তবে শর্ত একটাই এখানে কোনো কমার্শিয়াল বিল্ডিং হবে না। এটা হবে একটা ওপেন আর্ট ইউনিভার্সিটি।

দালালরা অবাক হয়ে ফিরে গেল। তারা ভেবেছিল অর্থের লোভে বৃদ্ধ রাজি হয়ে যাবে, কিন্তু অনিমেষ চৌধুরী এখন আর সেই শোকাতুর শিল্পী নন, তিনি এখন এক জাগ্রত পাহারাদার।

সেদিন রাতে বারান্দায় বসে অয়ন আর নীলা কথা বলছিল। চাঁদের আলোয় মায়াভিলার পোড়া রূপটাও যেন এক রহস্যময় গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অয়ন ধীর গলায় বলল, “নীলা, এই বাড়ির মহাকাব্য শেষ হতে এখনো অনেক দেরি। কিন্তু এই মহাকাব্যে কি আমার কোনো জায়গা হবে?”

নীলা অয়নের চোখের দিকে তাকাল। তার চোখে তখন জল আর ঠোঁটে এক ম্লান হাসি। সে বলল, অয়ন দা, তুমি তো সেই শুরু থেকেই মায়াভিলার ভাঙা জানলায়

রোদের মতো এসেছিলে। তোমাকে ছাড়া তো এই মহাকাব্যের ছন্দই মিলত না।

ঠিক তখনই বাড়ির পেছন দিক থেকে এক অদ্ভুত কান্নার শব্দ ভেসে এল। মল্লিকা দৌড়ে এলেন। অনিমেষ দা! তাড়াতাড়ি আসুন! কুয়োর ধারের সেই পুরনো পাথরটার নিচে কেউ একজন গোঙাচ্ছে!

সবাই টর্চ নিয়ে সেদিকে দৌড়ে গেল। পাথরটা সরাতেই দেখা গেল এক জীর্ণ-শীর্ণ মানুষ শুয়ে আছে। তার সারা গায়ে ক্ষত। সে আর কেউ নয় দীপ্ত! সে জেল থেকে পালানোর চেষ্টা করে মার খেয়ে মরণাপন্ন অবস্থায় বাড়ির পেছনের গেট দিয়ে ঢুকে পড়েছে।

অদীপ্তকে দেখে অনিমেষ বাবুর হাত কাঁপতে লাগল। ক্রোধ নাকি করুণা কোনটা তাঁকে গ্রাস করবে? অদীপ্তর রক্তাক্ত হাতে তখনও ধরা আছে সুলতার সেই প্রিয় নীল শাড়ির একটা ছেঁড়া অংশ।

মায়াভিলার মহাকাব্য কি তবে এক বিয়োগান্তক পরিণতির দিকে এগোচ্ছে? নাকি ক্ষমাতেই হবে এর শেষ?

দ্বাদশ অধ্যায়

ক্ষমা ও বিয়োগান্তক শেষ

রাতের মায়াভিলা আজ এক বিচিত্র নাটকের সাক্ষী। কুয়োর পাড়ে শ্যাওলা ধরা পাথরের ওপর রক্তাক্ত অদীপ্তকে দেখে মায়াভিলার প্রতিটি ইটের হাহাকার যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল। অদীপ্তর সারা গা ধুলো আর রক্তে মাখামাখি। জেল থেকে পালানোর সময় পুলিশের গুলিতে নয়, বরং সে যাদের টাকা দিতে চেয়েছিল সেই ভাড়াটে গুণ্ডাদের হাতেই সে মার খেয়েছে। স্বার্থের দুনিয়ায় যখন লগ্ন ফুরিয়ে যায়, তখন আপন লোকও ঘাতক হয়ে ওঠে অদীপ্ত আজ তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

নীলা ওরফে অরুণিমা স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে পড়ছে এই মানুষটাই মল্লিকা মাসিকে ২০ বছর ধরে অন্ধকারে আটকে রেখেছিল। এই মানুষটাই তার শৈশব কেড়ে নিয়েছিল। অন্যদিকে মল্লিকা, যিনি কুড়ি বছর ধরে এই পিশাচের হাতে তিলে তিলে শেষ হয়েছেন, তিনি ভয়ে শিউরে উঠলেন।

মল্লিকা আর্তনাদ করে উঠলেন, কেন ও এখানে ফিরে এল? ওকে বাইরে বের করে দাও অনিমেষ দা! ও থাকলে আবার আগুন জ্বলবে, ও থাকলে আবার অন্ধকার নেমে আসবে!

অনিমেষ চৌধুরী স্থির হয়ে অদীপ্তর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর হাতে সেই পুরনো লাঠি। অদীপ্ত অস্ফুট স্বরে গোঙাচ্ছে, “বাবা.. আমাকে বাঁচাও.. ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।“ তার সেই অহংকারী কণ্ঠস্বর আজ ভিখারির মতো শোনায়। অদীপ্তর হাতের মুঠোয় ধরা সুলতার সেই নীল শাড়ির টুকরোটা রক্তে ভিজে সপসপে হয়ে গেছে। কেন সে মরার সময় এই স্মৃতিটা আঁকড়ে ধরেছে? এটা কি সত্যিকারের অনুশোচনা, নাকি শেষ মুহূর্তের অভিনয়?

অয়ন পুলিশে খবর দেওয়ার জন্য ফোন বের করতেই অনিমেষ বাবু তার হাত ধরলেন। অয়ন অবাক হয়ে বলল, “দাদু, কেন বাধা দিচ্ছেন? ও একজন অপরাধী!”

অনিমেষ বাবু ধীর গলায় বললেন:-

অয়ন, ও অপরাধী ঠিকই, কিন্তু ও আজ এক মুমূর্ষু প্রাণী। মায়াভিলার ইতিহাসে কোনোদিন দয়া প্রার্থনাকারীকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। ওকে ভেতরে নিয়ে চল।

নীলা চিৎকার করে উঠল, না দাদু! আপনি ভুল করছেন। মরিচা যখন লোহার গভীরে ঢুকে যায়, তখন লোহা আর লোহা থাকে না, ওটা ক্ষয়ে ঝরে পড়ে। এই লোকটা আমাদের সবাইকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল!

অনিমেষ বাবু নীলার চোখের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে এক গভীর বিষাদ। তিনি বললেন:-

অরুণিমা, আমি যদি আজ প্রতিহিংসা নেই, তবে ওর আর আমার মধ্যে পার্থক্য কী রইল? মহাকাব্যে খলনায়কদেরও মৃত্যুর আগে একবার ক্ষমা পাওয়ার সুযোগ থাকে। সুলতা আজ বেঁচে থাকলে হয়তো এটাই চাইতেন।

অদীপ্তকে ধরাধরি করে বারান্দার এক কোণে নিয়ে আসা হলো। ডক্টর চ্যাটার্জি তড়িঘড়ি করে এসে পরীক্ষা করতে লাগলেন। অদীপ্তর পিঠে আর মাথায় গভীর ক্ষত। ডক্টর বাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন:- প্রচুর

রক্তপাত হয়েছে। হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় ও নেই। তবে ও কিছু বলতে চাইছে।

অনিমেষ বাবু অদীপ্তর মুখের কাছে কান নিলেন। অদীপ্ত কাঁপাকাঁপা হাত দিয়ে সুলতার নীল শাড়ির টুকরোটা অনিমেষ বাবুর হাতে গুঁজে দিল। তারপর খুব কষ্টে ফিসফিস করে বলল, "বাবা... আলমারির... গোপন লকার... চাবি নেই... ভাঙতে হবে... ওখানে... মায়ের... আসল চিঠিটা আছে। আমি ওটা পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম... পারিনি... হাত কাঁপছিল।"

একটু থেমে অদীপ্ত চোখ মেলল। নীলার দিকে তাকিয়ে শেষবারের মতো অস্ফুট গলায় বলল, "অরুণিমা... আমি তোর বাবা নই... তোকে ক্ষমা চাওয়ার যোগ্যতাও আমার নেই... তোর বাবা... অবিনাশই ছিল..."

বলেই অদীপ্তর হাতটা ঝুলে পড়ল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মায়াভিলার সেই কুসন্তান চিরতরে বিদায় নিল। বারান্দায় অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা। ঘৃণা আর প্রতিহিংসার অবসান ঘটল এক মর্মান্তিক মৃত্যুতে।

মল্লিকা হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন। এই কান্না আনন্দের নয়, এই কান্না ২০ বছরের যন্ত্রণার এক বিষাক্ত বহিঃপ্রকাশ। অনিমেষ চৌধুরী একদৃষ্টিতে অদীপ্তর নিথর দেহের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর ডায়েরিতে আজ আর একটিও শব্দ যোগ হলো না। কারণ, কিছু যন্ত্রণার কোনো ভাষা হয় না।

পরদিন সকালে পুলিশ এসে অদীপ্তর দেহ নিয়ে গেল। আইনি ঝামেলা মিটতে দুপুর হয়ে এল। কিন্তু সবার মনে এখন একটাই প্রশ্ন সেই আসল চিঠি তে কী লেখা আছে?

অনিমেষ বাবু আর অয়ন মিলে সুলতার সেই আধপোড়া আলমারির গোপন খোপটা কুঠার দিয়ে ভাঙলেন। ভেতরে পাওয়া গেল একটা কাঠের বাক্স। তার ভেতর ছিল একটা পুরনো হলদে হয়ে যাওয়া চিঠি। চিঠিটা সুলতা লিখেছিলেন তাঁর মৃত্যুর সাত দিন আগে।

চিঠিটা পড়ার সময় অনিমেষ বাবুর হাত কাঁপছিল। সুলতা লিখেছেন:-

“অনিমেষ, আমি জানি অদীপ্ত বিপথে গেছে। কিন্তু ওর এই অধঃপতনের কারণ হয়তো আমারই কোনো ভুল ছিল। তবে আজ আমি এক সত্য কবুল করছি। অদীপ্ত জানত না যে, এই মায়াভিলার আসল মালিক আমি বা তুমি নই। ১৯৪৫ সালে তোমার বাবা যখন এই বাড়িটা নিলাম থেকে কেনেন, তখন আসল মালিকের এক নাতনিকে তিনি কথা দিয়েছিলেন যে মায়াভিলা সবসময় শিল্পের জন্য খোলা থাকবে। সেই নাতনি আর কেউ নয়, আমার ছোট বোন মল্লিকার মা। অর্থাৎ মল্লিকা আর আমি সৎ বোন ছিলাম। এই বাড়ির রক্তে মিশে আছে দুটি পরিবারের ইতিহাস। অদীপ্ত যখন মল্লিকার ওপর অত্যাচার শুরু করেছিল, সে আসলে নিজের উত্তরাধিকার ধ্বংস করছিল।“

চিঠির নিচে সুলতা এক বিশেষ নির্দেশিকা দিয়ে গেছেন। মায়াভিলার পেছনের বাগানে যেখানে সেই পোড়া শিউলি গাছটা আছে, তার ঠিক দশ পা ডাইনে একটি পুরনো পাথর চাপা দেওয়া কুঠুরি আছে। সেখানে রাখা আছে সুলতার আঁকা এক রহস্যময় ছবি, যার নাম ‘মরিচায় বোনা মহাকাব্য’।

অনিমেষ বাবু বুঝতে পারলেন, এই গল্পের শিরোনাম তিনি দেননি, দিয়েছেন সুলতা। সুলতা অনেক আগেই জানতেন যে, এই বাড়ির ওপর জং ধরবে, কিন্তু সেই জংয়ের আড়ালেই ফুটে উঠবে আসল সত্যের রঙ।

নীলা আর অয়ন সেই কুঠুরিটা খুঁড়তে শুরু করল। বিকেল যখন গড়িয়ে সন্ধ্যা হচ্ছে, তখন মাটির নিচ থেকে বের হয়ে এল একটি ওয়াটারপ্রুফ প্যাকেটে মোড়া বিশাল এক ক্যানভাস।

প্যাকেটটা যখন খোলা হলো, মায়াভিলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল। ক্যানভাসে আঁকা আছে একটি বিশালাকার বাড়ি অর্ধেকটা সোনার রঙে মোড়া আর বাকি অর্ধেকটা ঘন কালো জং ধরা। কিন্তু জং ধরা অংশের প্রতিটি সূক্ষ্ম খাঁজ থেকে জন্ম নিচ্ছে ছোট ছোট উজ্জ্বল ফুল। ছবির একদম নিচে একটি উক্তি লেখা:-

“ক্ষয় মানেই ধ্বংস নয়, বিবর্তন। আগুনের পর যা অবশিষ্ট থাকে, সেটাই হলো সত্য।“

অনিমেষ চৌধুরী ছবির দিকে তাকিয়ে দুহাত তুলে প্রণাম করলেন। তিনি বললেন, “সুলতা, তুমিই এই মহাকাব্যের আসল রচয়িতা। আমরা সবাই ছিলাম কেবল চরিত্র।“

মায়াভিলার পুনর্গঠন এখন আর কেবল মেরামত নয়, এটা এখন এক প্রায়শ্চিত্তের যজ্ঞে পরিণত হলো। মল্লিকা এবার নিজের পরিচয় ফিরে পেলেন। নীলা বুঝতে পারল, তার লড়াইটা ছিল শিকড় খুঁজে পাওয়ার।

কিন্তু গল্পের এক নতুন ছায়ার উদয় হলো। মায়াভিলার গেটে এসে দাঁড়ালেন এক বিদেশি ভদ্রলোক। তাঁর হাতে একটি পুরনো খবরের কাগজের কাটিং। তিনি ইংরেজি বাংলায় মিশিয়ে বললেন, আমি এই বাড়ির সেই আসল মালিকের বংশধর, যা ১৯৪৫ সালে নিলামে উঠেছিল। আমি আমার অধিকার বুঝে নিতে এসেছি।

আগুনে পোড়া মায়াভিলা কি তবে আবার নতুন আইনি জালে জড়িয়ে পড়বে? কে এই বিদেশি আগন্তুক?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রিচার্ড হ্যামিল্টনের হানা

মায়াভিলার পুড়ে যাওয়া ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বিদেশি ভদ্রলোকটির পরনে ছাই রঙের ওভারকোট। তাঁর হাতে থাকা পুরনো কাগজের কাটিংটা বাতাসে তিরতির করে কাঁপছে। তাঁর নীল চোখে এক অদ্ভুত নির্লিপ্ততা, যেন তিনি কোনো হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে এসেছেন। মায়াভিলার এই করুণ দশা দেখেও তাঁর মুখে কোনো সহমর্মিতার চিহ্ন নেই।

অনিমেষ চৌধুরী বারান্দা থেকে নেমে এলেন। লাঠির ঠকঠক শব্দটা আজ যেন একটু বেশিই ভারি শোনাচ্ছে। তিনি ভদ্রলোকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শান্ত স্বরে বললেন, কে আপনি? আর এই পোড়া ভিটেয় আপনার কী প্রয়োজন?

ভদ্রলোকটি একটু বাঁকা হাসি হেসে উত্তর দিলেন,

আমার নাম রিচার্ড হ্যামিল্টন। ১৯৪৫ সালের সেই নিলামের কথা হয়তো আপনার মনে নেই মি. চৌধুরী,

কিন্তু ইতিহাস সবকিছু মনে রাখে। আমার প্রপিতামহ জেমস হ্যামিল্টন ছিলেন এই নীলকুঠির সমগোত্রীয় অট্টালিকার মালিক। যুদ্ধের ডামাডোলে তিনি যখন দেশ ছাড়েন, তখন আপনার বাবা হিমাংশু চৌধুরী এটি নামমাত্র মূল্যে নিলামে কিনেছিলেন। কিন্তু সেই বিক্রয়পত্রে একটি গোপন শর্ত ছিল, যা ৯৯ বছরের লিজে আবদ্ধ ছিল। আজ সেই লিজের মেয়াদ শেষ হওয়ার মুখে।

অয়ন আর নীলা এতক্ষণ পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। রিচার্ডের কথা শুনে অয়নের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। সে এগিয়ে এসে বলল, ৯৯ বছর? আপনি কি জানেন এই বাড়ি এখন হেরিটেজ ট্রাস্টের আন্ডারে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় আছে? আপনার কাছে কোনো বৈধ দলিল আছে?

রিচার্ড পকেট থেকে একটি চামড়ার ব্যাগ বের করলেন। তার ভেতর থেকে একটি হলদেটে চর্মপত্র বের করে দেখালেন। দলিল তো অবশ্যই আছে। তবে আমি এখানে মামলা করতে আসিনি। আমি এসেছি একটি বিশেষ জিনিসের খোঁজে। ১৯৪৫ সালে আমার প্রপিতামহ যখন এই বাড়ি ছাড়েন, তিনি একটি

বিশালাকার বেগুনি মণি পাথরের বুদ্ধ মূর্তি এই বাড়িতেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেই মূর্তিটির আন্তর্জাতিক মূল্য বর্তমানে কয়েক মিলিয়ন ডলার। ওটা ফিরিয়ে দিলে আমি এই বাড়ির ওপর সব দাবি ছেড়ে দেব।

মায়াভিলার চারপাশের বাতাস যেন হঠাৎ থমকে গেল। মণি-মাণিক্যের গল্প এই বাড়ির মরিচা ধরা ঐতিহ্যের সাথে কেমন যেন বেমানান লাগছিল। অনিমেষ বাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর বাবা কোনোদিন তাঁকে এই মূর্তির কথা বলেননি। কিন্তু মল্লিকা মাসি, যিনি ওই পাতালঘরে ২০ বছর কাটিয়েছেন, তাঁর মুখটা হঠাত সাদা হয়ে গেল।

মল্লিকা কাঁপা গলায় বললেন, অনিমেষ দা... ওই মূর্তির কথা দিদি জানত। সুলতা আমাকে একবার বলেছিল যে, এই বাড়ির মূল ভিত্তির গভীরে এমন কিছু একটার পাহারা বসানো আছে যা মানুষের লোভ জাগিয়ে তোলে। কিন্তু দিদি ওটা কাউকে সরাতে নিষেধ করেছিল। তিনি বলতেন ওটা সরলেই মায়াভিলার প্রাণ চলে যাবে।

রিচার্ড অস্থির হয়ে উঠলেন। প্রাণ? মায়া? ওসব গল্পের কথা বাদ দিন। আমাকে আমার পূর্বপুরুষের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিন, আমি লিজের সব কাগজ পুড়িয়ে দিয়ে কালই লন্ডন চলে যাব। আর যদি না দেন, তবে আগামী সপ্তাহে আমার আইনজীবীরা এসে এই পুরো জমিটাই সিল করে দেবে।

অনিমেষ চৌধুরী গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। মায়াভিলার ওপর একের পর এক অভিশাপ যেন আছড়ে পড়ছে। তিনি ডায়েরির একটি পাতায় বড় বড় করে লিখলেন–

“মরিচা শুধু লোহাকে খায় না, সে মানুষের বিবেককেও কুড়ে কুড়ে খায়। যে সোনার পাথরের মূর্তির জন্য রিচার্ড এসেছে, তা হয়তো এই বাড়ির রক্ষার চেয়ে বিনাশের কারণই বেশি হবে।“

সেদিন রাতে মায়াভিলার ভেতর এক গোপন বৈঠক বসল। অয়ন, নীলা, মল্লিকা আর অনিমেষ বাবু। অয়ন রিচার্ডের আনা কাগজের ফটোকপিগুলো পরীক্ষা করে

বলল, “দলিলে কিছু ফাঁকফোকর তো আছেই। কিন্তু যদি ও কোর্টে যায়, তবে পুনর্গঠনের কাজ থেমে যাবে। আপাতত আমাদের খুঁজে বের করতে হবে ওই মূর্তিটা কোথায়।“

নীলা বলল, “দাদু, সুলতা দিদার সেই ১২টি ক্যানভাস কি আমাদের কোনো ইশারা দিচ্ছে না? সপ্তম ক্যানভাসে একটা অদ্ভুত বিমূর্ত ছবি ছিল, সেখানে শুধু বেগুনি রঙের কিছু ছিটেফোঁটা ছিল। আমি তখন বুঝতে পারিনি, এখন মনে হচ্ছে দিদা ওই ‘অ্যামিথিস্ট’ মূর্তির কথাই বলতে চেয়েছিলেন।“

সবাই সেই ক্যানভাসটা নিয়ে বসলেন। দেখা গেল, একটি ছায়াবৃত গাছের নিচে একটি পাথরের বুদ্ধের অবয়ব আঁকা আছে। কিন্তু সেই জায়গাটি বাড়ির ঠিক কোথায়? মায়াভিলার বাগান তো অদীপ্তর আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে।

হঠাৎ করেই নীলার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল। সে বলল, “দিদা সবসময় বলতেন, ‘যেখানে শেষ, সেখানেই শুরু’। এই বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণে সেই পুরনো কুয়োটার কাছে যেখানে সেই শিউলি গাছটা ছিল...

অদীপ্ত আগুন দেওয়ার পর ওই এলাকাটা সবচেয়ে বেশি পুড়েছে। কুয়োর পাথরেও ফাটল ধরেছে।“

মধ্যরাতে সবাই যখন ঘুমে আচ্ছন্ন, রিচার্ড হ্যামিল্টন নিজের হোটেলে ফেরেননি। তিনি চোরের মতো মায়াভিলার পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকেছেন। তাঁর হাতে একটি অত্যাধুনিক মেটাল ডিটেক্টর। তিনি জানেন, মি. চৌধুরী সহজে ওটা দেবেন না। তাই তিনি নিজেই শুরু করেছেন তাঁর সন্ধান।

বাগানের এক কোণে বিচিত্র একটা শব্দ করে উঠল তাঁর মেশিনটা। রিচার্ডের চোখ চকচক করে উঠল। তিনি মাটি খুঁড়তে শুরু করলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, মায়াভিলার মাটির নিচে শুধু সম্পদ নেই, আছে এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক জাল। ১৯৪৫ সালে হিমাংশু চৌধুরী সেই মূর্তির চারপাশে এমনভাবে জলবাহী সুরঙ্গ তৈরি করেছিলেন যে, ওটা সরাতে গেলে পুরো বাগান বসে যাবে।

হঠাত একটা বিকট ধস নামল। রিচার্ডের চিৎকারে অনিমেষ বাবুরা জেগে উঠলেন। সবাই দৌড়ে বাগানে গিয়ে দেখলেন, কুয়োর ধারের সেই পুরনো জমিটা বসে

গেছে এবং রিচার্ড কোমড় অবধি গর্তে আটকে আছেন। আর সেই গর্তের গভীর থেকে বের হয়ে আসছে এক মায়াবী বেগুনি আলো!

সেই আলো যেন আগুনের চেয়েও উজ্জ্বল, অথচ বরফের মতো শীতল। মাটির গভীরে বসে থাকা সেই বুদ্ধ মূর্তির মুখটা দেখা গেল। বুদ্ধের চোখে যেন এক অনন্ত করুণা, যা রিচার্ডের লোভকে উপহাস করছে।

অনিমেষ বাবু আর্তনাদ করে উঠলেন, “নীলা! সরিয়া আয়! মাটি বসে যাচ্ছে!”

রিচার্ড সাহায্যের জন্য হাত বাড়ালেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর অন্য হাতটা তখনও সেই মূর্তির গলার হারটা ধরার জন্য উন্মুখ। মানুষের লোভ যে মৃত্যুপথযাত্রী হয়েও মরে না, রিচার্ড হ্যামিল্টন আজ তার জীবন্ত উদাহরণ।

অয়ন দড়ি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রিচার্ডকে বাঁচাতে। কিন্তু সেই মুহূর্তে মাটির নিচ থেকে এক প্রবল জলোচ্ছ্বাস শুরু হলো। হিমাংশু চৌধুরীর তৈরি সেই প্রাচীন ‘ওয়াটার লকিং সিস্টেম’ আজ সচল হয়ে উঠেছে। মায়াভিলা কি তার শেষ সম্পদ বাঁচাতে গিয়ে তার রক্ষকদেরও গ্রাস করবে?

রিচার্ডের লোভ বনাম অনিমেষের শিল্পের লড়াই এখন এক ভয়াবহ মোড়ে। মায়াভিলার মাটিতে কি তবে রক্তের দাগ লাগবে নাকি সেই বুদ্ধ মূর্তির শান্তিতে সব ধুয়ে যাবে?

চতুর্দশ অধ্যায়

লোভ বনাম মহিমা

কুয়োর ধারের সেই পুরনো জমিটা যখন হুড়মুড় করে বসে গেল, তখন মায়াভিলার নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল। মাটির গভীর থেকে উঠে আসা সেই অলৌকিক বেগুনি আলো রিচার্ড হ্যামিল্টনের লোভী মুখটাকে এক বিচিত্র বীভৎসতায় রাঙিয়ে দিচ্ছিল। রিচার্ড কোমড় অবধি মাটির নিচে আটকে থাকলেও তাঁর আঙুলগুলো তখনো সেই অ্যামিথিস্ট বুদ্ধ মূর্তির গ্রীবা স্পর্শ করার জন্য ছটফট করছিল।

অয়ন দড়ি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গর্তের ধারে। “মি. হ্যামিল্টন! মূর্তি ছাড়ুন, দড়িটা ধরুন! সুরঙ্গটা ভেঙে পড়ছে!” অয়নের চিৎকার বাতাসের আর্তনাদে মিশে যাচ্ছিল। কিন্তু রিচার্ড তখন এক ঘোরের মধ্যে। তাঁর কানে তখন প্রাণের মায়া নয়, বরং হিরে-জহরত আর বিলিয়ন ডলারের ঝনঝনানি বাজছে।

হঠাৎ করেই মাটির নিচ থেকে এক ভয়ংকর শব্দ শোনা গেল যেন কোনো এক দানব জলপান করছে। হিমাংশু চৌধুরী ১৯৪৫ সালে এই মূর্তিকে কেন্দ্র করে এক অদ্ভুত প্রকৌশল তৈরি করেছিলেন। মূর্তির ঠিক নিচেই ছিল বাড়ির মূল জলনিকাশি নালির একটি সংযোগ। যদি কেউ গায়ের জোরে বা কায়দা না জেনে সেই মূর্তিটি সরানোর চেষ্টা করে, তবে ভূগর্ভস্থ জলের চাপ হুড়মুড় করে সেই সুরঙ্গে ঢুকে পড়বে।

অনিমেষ চৌধুরী বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাঁপছিলেন। তিনি দেখলেন, বেগুনি আলোর তেজ হঠাৎ করেই কমে গেল এবং তার জায়গায় ফিনকি দিয়ে বের হয়ে এল কর্দমাক্ত নোনা জল। কুয়োর চারপাশের পাড়গুলো তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে লাগল।

“নীলা! অরুণিমা! কাছে যাস না!” অনিমেষ বাবুর গলার স্বর কান্নায় বুজে আসছিল।

নীলা ততক্ষণে অয়নকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেছে। রিচার্ড যখন বুঝতে পারলেন জল তাঁর বুক অবধি উঠে এসেছে, তখন তাঁর মোহ ভাঙল। তিনি দুই হাত বাড়িয়ে দিলেন অয়নের দিকে। অয়ন আর নীলা

মিলে সর্বশক্তিতে টানতে শুরু করল। ঠিক যে মুহূর্তে রিচার্ডকে গর্ত থেকে টেনে উপরে তোলা হলো, সেই মুহূর্তে এক দানবীয় জলোচ্ছ্বাসে পুরো গর্তটা তলিয়ে গেল। সেই বহুমূল্য অ্যামিথিস্ট বুদ্ধ মূর্তিটি জলের তোড়ে মাটির আরও গভীরে, হয়তো কোনো পাতাল সুড়ঙ্গে হারিয়ে গেল চিরতরে।

রিচার্ড হ্যামিল্টন ভিজে একাকার হয়ে বাগানে পড়ে রইলেন। তাঁর দুহাতে এখন শুধুই কাদা আর পলি মাটি। তাঁর সেই দম্ভ, সেই আভিজাত্য সব ধুলোয় মিশে গেছে। তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কিন্তু তাঁর এই কান্না হারানো মূর্তির জন্য নয়, বরং এই মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার এক আদিম ভয়ের জন্য।

মায়াভিলার আকাশটা তখন ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে। ভোরের প্রথম আলো যখন সেই কাদা মাখা গর্তের ওপর পড়ল, তখন এক অলৌকিক দৃশ্য দেখা গেল। যে জল মাটির নিচ থেকে ফোয়ারার মতো বের হচ্ছিল, তা এখন শান্ত হয়ে একটি স্বচ্ছ জলাধারের মতো হয়ে গেছে। আর সেই জলের ওপর ভাসছে একটি ছোট কাঠের বাক্স, যা ওই সুরঙ্গেই লুকানো ছিল।

অয়ন বাক্সটি সাবধানে তুলে আনল। অনিমেষ বাবুর সামনে যখন বাক্সটি খোলা হলো, তখন দেখা গেল ভেতরে কোনো সোনাদানা নেই, আছে একটি হাতে লেখা ডায়েরি আর কিছু স্কেচ। ওটা রিচার্ডের প্রপিতামহ জেমস হ্যামিল্টনের ডায়েরি।

ডায়েরির পাতায় লেখা ছিল এক অদ্ভুত স্বীকারোক্তি:

আমি জানি, এই মূর্তিটি নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার উত্তরসূরিরা একদিন ফিরে আসবে। কিন্তু আমি এটি মায়াভিলার মাটিতে উৎসর্গ করে গেলাম। ১৯৪৫ সালে যখন দাঙ্গা শুরু হয়েছিল, তখন হিমাংশু চৌধুরী আমার পরিবারকে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রক্ষা করেছিলেন। এই মূর্তির মূল্য তাঁর বন্ধুত্বের চেয়ে বেশি নয়। এটি এই বাড়ির রক্ষাকবচ হয়ে থাকুক। যে দিন মানুষের লোভ একে স্পর্শ করবে, সেদিনই এটি মাটির গভীরে হারিয়ে যাবে।

রিচার্ড হ্যামিল্টন মাথা নিচু করে বসে রইলেন। তাঁর প্রপিতামহ যা দান করে গিয়েছিলেন, তিনি তা চুরি করতে এসেছিলেন। লিজের সেই পুরনো দলিলটা তিনি পকেট থেকে বের করে অনিমেষ বাবুর হাতে তুলে

দিলেন। মি. চৌধুরী, আমি ক্ষমা চাইছি। মায়াভিলা আপনাদেরই ছিল, আপনাদেরই থাকবে। এই দলিল আমি আর দাবি করব না।

অনিমেষ বাবু ডায়েরির সেই পাতায় হাত বোলালেন। মরিচা শুধু লোহাতে ধরে না, সম্পর্কের ইতিহাসেও ধরে। আজ সেই পুরনো ধুলোবালি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল।

বিকেলের দিকে অয়ন আর নীলা সেই নতুন জলাধারটির পাশে এসে দাঁড়াল। মায়াভিলার বাগানটা পুড়ে ছাই হলেও, আজ সেখানে জলের এক নতুন উৎস তৈরি হয়েছে। মল্লিকা মাসি কুয়ো থেকে জল তুলে সেই মরা শিউলি গাছটার গোড়ায় ঢাললেন।

Mukto Yabuk
Anything Talented Works
Works Publication

অনিমেষ চৌধুরী নিজের ডায়েরিতে লিখলেন–

“মায়াভিলা আজ তার শেষ মোহ ত্যাগ করল। মণি-মাণিক্য নয়, মানুষের বিশ্বাসই হলো এই মহাকাব্যের আসল অলঙ্কার। যে মূর্তিটি হারিয়ে গেল, সে আসলে

তার কাজ শেষ করে গেছে। সে রিচার্ডকে শিক্ষা দিয়েছে এবং আমাদের নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছে।“

কিন্তু রাত হতেই পাড়ার পরিবেশটা আবার বদলে গেল। অদীপ্তর সেই সাঙ্গপাঙ্গরা, যারা জেলে যাওয়ার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল, তারা খবর পেয়েছে যে রিচার্ড খালি হাতে ফিরেছেন। তারা ভাবছে অনিমেষ বাবু নিশ্চয়ই মূর্তিটি কোথাও লুকিয়ে ফেলেছেন। তাদের মধ্যে একজন হলো কালু, যে অদীপ্তর ছায়াসঙ্গী ছিল।

কালু অন্ধকারের আড়ালে মায়াভিলার পেছনে পাঁচিল টপকে ঢুকল। তার হাতে একটা পুরনো ধারালো হাঁসুয়া। সে মূর্তির লোভে নয়, সে এসেছে প্রতিশোধ নিতে। সে মনে করে অদীপ্তর এই দশার জন্য নীলা আর অয়ন দায়ী।

নীলা তখন বারান্দায় একা বসে সুলতার সেই ১২টি ক্যানভাসের শেষটি আঁকার চেষ্টা করছিল। সে বুঝতে পারছিল না শেষ ছবিটা কী হবে। হঠাৎ সে তার পেছনে একটা শীতল নিশ্বাস অনুভব করল।

কে? নীলা ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল কালুর হিংস্র চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বলছে।

মায়াভিলার মহাকাব্য কি তবে আবার রক্তের কালিতে লেখা হবে? নাকি বুদ্ধের সেই অলৌকিক শান্তি কালু নামক শয়তানকেও স্পর্শ করবে?

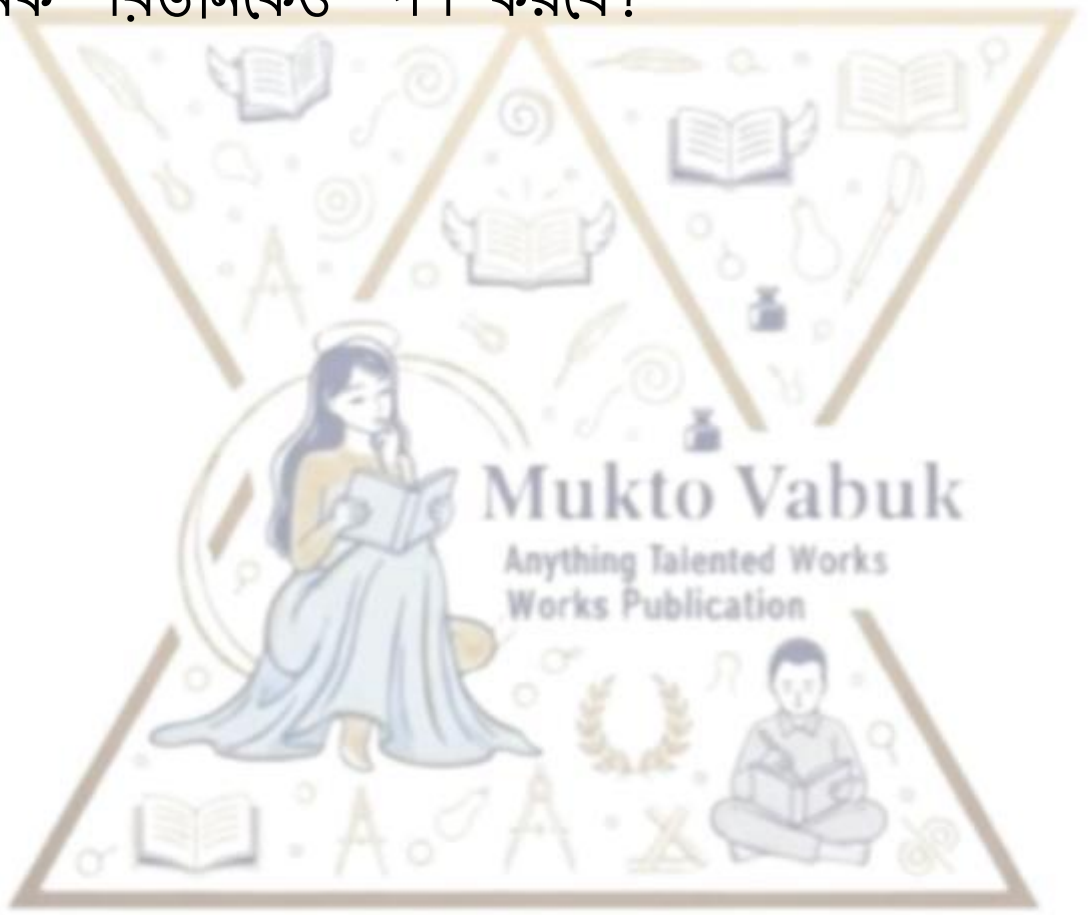

পঞ্চদশ অধ্যায়

শেষ বিষবৃক্ষ

মায়াভিলার করিডোরে বাতাসের শব্দটা আজ কেমন যেন তীক্ষ্ণ, ঠিক যেন শাঁ শাঁ করে ছুটে আসা কোনো তীরের মতো। নীলা যখন বারান্দায় একা বসে সুলতার শেষ ক্যানভাসটার দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল, ঠিক তখনই তার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। সে অনুভব করল, পেছনে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে যার নিশ্বাসে রয়েছে আদিম হিংস্রতা আর তামাকের কটু গন্ধ।

নীলা দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল কালুর সেই বীভৎস চেহারা। অদীপ্তর বিশ্বস্ত খুনি কালু এখন উন্মত্ত। অদীপ্তর মৃত্যু আর বুদ্ধ মূর্তির হাতছাড়া হওয়া সব মিলিয়ে তার ভেতরে এখন শুধু ধ্বংসের নেশা। সে ভাবছে, এই ধ্বংসস্তূপের নিচে নিশ্চয়ই আরও সোনাদানা আছে যা অনিমেষ বাবু লুকিয়ে রেখেছেন।

কালু দাঁতে দাঁত চেপে ফিসফিস করে বলল:-

খুকি, অনেক খেলেছিস। অদীপ্ত দাদাকে খাইয়েছিস, এখন বুড়োটাকে নিয়ে রাজার হালে থাকবি ভাবছিস? ওই মূর্তির বাকি হিরেগুলো কোথায় বের কর, নইলে আজ তোর এই সুন্দর গলায় আমার এই হাঁসুয়াটা বসে যাবে।

নীলা ভয় পেল না। তার চোখে তখন সুলতার সেই তেজ আর মল্লিকা মাসির ত্যাগের আগুন। সে শান্ত গলায় বলল, কালু কাকা, যা মাটির নিচে চলে গেছে তা আর ফিরে আসবে না। ওটা আমাদের নয়, ওটা এই বাড়ির আত্মা। তুমি বরং পালিয়ে যাও, পুলিশ যেকোনো সময় আসবে।

কালু অট্টহাসি হেসে উঠল। পুলিশ? এই মরা বাড়িতে পুলিশ আসার আগে আমি তোদের সবার লাশ ফেলে দেব।সে হাঁসুয়া উঁচিয়ে নীলার দিকে এগোতে লাগল।

ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকার কোণ থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে এলেন মল্লিকা মাসি। তাঁর হাতে কোনো অস্ত্র নেই, কিন্তু তাঁর দুচোখে এমন এক জ্যোতি যা কালুকে থমকে দিল। বিশ বছর পাতালঘরের অন্ধকারে থাকা এই নারী আজ মায়াভিলার জীবন্ত পাহারাদার।

মল্লিকা বললেন, কালু, তুই চিনতে পারছিস আমাকে? বিশ বছর আগে অদীপ্ত যখন আমাকে ওই ঘরে বন্দি করেছিল, তুই তখন গেটে পাহারা দিতিস। আজ সেই দিন শেষ। এই বাড়ির ইটের প্রতিটি কণা তোর পাপের সাক্ষী।

কালু একটু হকচকিয়ে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই ক্রোধে ফেটে পড়ল। “পাগলী বুড়ি! আজ তোকেও খতম করব!”

সে মল্লিকার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই নিচতলা থেকে অয়নের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। অয়ন আর ডক্টর চ্যাটার্জি টর্চ নিয়ে ওপরের দিকে উঠে আসছেন। কালু বুঝতে পারল সে চারপাশ থেকে ঘিরে যাচ্ছে। সে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে নীলার হাত ধরে টান দিয়ে বারান্দার রেলিংয়ের দিকে নিয়ে গেল। আসবি না কেউ! আসলে একে নিচে ফেলে দেব!”

পুরো মায়াভিলা এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সাক্ষী হলো। অনিমেষ বাবু ততক্ষণে লাঠি হাতে বারান্দায় এসে পৌঁছেছেন। তিনি দেখলেন কালু তাঁর নাতনির গলায় অস্ত্র ধরে আছে। অনিমেষ বাবু এক অদ্ভুত

স্থিরতা নিয়ে এগিয়ে গেলেন। তিনি লাঠিটা মেঝেতে ঠুকে বললেন–

“কালু, তুই যা খুঁজছিস তা মূর্তির হিরে নয়। তুই খুঁজছিস মুক্তি। এই বাড়ি তোকে কোনোদিন ক্ষমা করবে না যদি তুই আজ আর একটা রক্তপাত করিস। দেখ ওই কোণে সুলতার শেষ ছবিটা।“

সবাই তাকিয়ে দেখল, নীলা যে ক্যানভাসটা নিয়ে বসেছিল, সেখানে রক্তবর্ণের এক আগুনের নিচে ছোট ছোট সাদা ফুল ফুটেছে। অনিমেষ বাবু বলতে থাকলেন, মরিচা শুধু ধ্বংস করে না, সে নতুন অঙ্কুরোদগমকেও সাহায্য করে। তুই কি চাস তোর জীবনটা এই মরিচাতেই শেষ হয়ে যাক?

কালুর হাত কাঁপতে শুরু করল। ঠিক সেই মুহূর্তে মায়াভিলার সেই নতুন জলাধার থেকে এক অদ্ভুত কুয়াশা উঠে এল। আগুনের ধোঁয়ার মতো নয়, বরং পবিত্র এক শুভ্র কুয়াশা। কালু দেখল, তার চারপাশে যেন অদীপ্তর আর্তনাদ আর মল্লিকার বন্দিদশার

ছায়াগুলো ভিড় করছে। পাপের ভার বহন করা তার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না।

অয়ন সুযোগ বুঝে কালুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং হাঁসুয়াটা কেড়ে নিল। অয়ন আর পাড়ার কয়েকজন যুবক মিলে কালুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। পুলিশ আসার আগেই কালু কান্নায় ভেঙে পড়ল। সে স্বীকার করল, অদীপ্তর সব কুকীর্তির কথা সে জানত এবং সে নিজেও আজ মুক্ত হতে চায় এই পাপের বোঝা থেকে।

ভোরের আলো যখন মায়াভিলার ওপর পড়ল, তখন এক অদ্ভুত শান্তি বিরাজ করছিল। পুলিশ কালুকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর অনিমেষ বাবু নীলার কাছে গিয়ে বসলেন। নীলার গায়ে কালুর নখের আঁচড় লেগেছে, কিন্তু তার মুখে বিজয়ের হাসি।

অনিমেষ বাবু বললেন:-

অরুণিমা, আজ তুই এই বাড়ির শেষ মরিচাটা ধুয়ে দিলি। কালু শুধু একজন মানুষ নয়, ও ছিল অদীপ্তর রেখে যাওয়া শেষ বিষবৃক্ষ।

নীলা ডায়েরির সেই শেষ পৃষ্ঠায় এক নতুন মহাকাব্যিক লাইন যোগ করল-

“ছায়া অন্ধকার থেকে জন্মায় ঠিকই, কিন্তু আলো তাকে গ্রাস করতে সময় নেয় না। মায়াভিলা আজ সত্যি মুক্ত।”

কিন্তু মায়াভিলার মহাকাব্য এখানেই শেষ নয়। বিশু মাতব্বর আর তার প্রোমোটার দল তখনো বাইরে ওত পেতে আছে। তারা আইনি পথে না পেরে এখন রাজনৈতিক চাপ তৈরির চেষ্টা করছে।

ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন:–

অনিমেষ, আমাদের এখন মায়াভিলাকে একটি আর্ট গ্যালারি হিসেবে রেজিস্ট্রি করতে হবে খুব দ্রুত। অয়ন, তুমি কি দিল্লির সেই আর্কিওলজিক্যাল হেডকে ফোন করেছো?

অয়ন মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, তাঁরা আসছেন। কিন্তু নীলা, তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। রিচার্ড হ্যামিল্টন যাওয়ার সময় আমাকে একটা ছোট চিরকুট দিয়ে গেছেন। ওটা শুধু তোমার জন্য।

নীলা চিরকুটটা খুলল। সেখানে লেখা ছিল–

অরুণিমা, আমি যখন বুদ্ধ মূর্তিটি স্পর্শ করেছিলাম, আমি এক মুহূর্তের জন্য আমার প্রপিতামহের কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, মায়াভিলার দেয়ালের ভেতরে হিরে নয়, লুকানো আছে এক অমর রঙের ফর্মুলা যা দিয়ে আঁকা ছবি কোনোদিন ফিকে হয় না। ওটাই তোমার উত্তরাধিকার।

মায়াভিলার প্রতিটি ইট কি তবে রঙের জাদুতে অমর হতে চলেছে?

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

ষোড়শ অধ্যায়

অমর রঙের আবিষ্কার

মায়াভিলার পুড়ে যাওয়া ধ্বংসস্তূপের ওপর যখন বৃষ্টির হালকা ছাঁট নামল, তখন চারপাশটা এক সোঁদা গন্ধে ভরে উঠল। পোড়া কাঠের গন্ধ আর ভিজে মাটির এই মিশ্রণটা যেন এক অদ্ভুত বার্তা বয়ে আনছিল। রিচার্ড হ্যামিল্টনের দিয়ে যাওয়া সেই চিরকুটটা নীলার হাতে তখনো কাঁপছে। ‘অমর রঙের ফর্মুলা’ এই শব্দদুটো যেন কোনো রূপকথার মন্ত্রের মতো মায়াভিলার আকাশে বাতাসে অনুরণিত হতে লাগল।

অনিমেষ চৌধুরী বারান্দার এক কোণে বসে সুলতার সেই পুরনো পালকিটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি ভাবছিলেন, তাঁর বাবা হিমাংশু চৌধুরী কি সত্যিই এমন কিছু রেখে গেছেন যা সময়কে জয় করতে পারে? রঙের প্রতি তাঁর বাবার এক আজন্ম টান ছিল। তিনি ছবি আঁকতেন না ঠিকই, কিন্তু রঙের রসায়ন নিয়ে দিনের পর দিন ল্যাবরেটরিতে পড়ে থাকতেন।

অয়ন আর নীলা মিলে মায়াভিলার সেই পাতালঘরের একদম শেষ প্রকোষ্ঠে ঢুকল। যেখানে এর আগে কেউ প্রবেশ করেনি। সেখানে দেয়ালের গায়ে সারিবদ্ধভাবে সাজানো ছিল মাটির ছোট ছোট কলস। প্রতিটা কলসের গায়ে প্রাচীন সঙ্কেতে কিছু একটা লেখা।

নীলা একটি কলসের ঢাকনা খুলতেই ঘরটা এক স্বর্গীয় সুবাসে ভরে উঠল। না ওটা কোনো কৃত্রিম সুগন্ধি নয়, ওটা ছিল কয়েকশ বছরের পুরনো ভেষজ আর খনিজ পদার্থের এক আদিম ঘ্রাণ। কলসের ভেতরকার রঙগুলো এখনো জমাট বাঁধেনি, বরং থকথকে হয়ে আছে।

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

নীলা বিস্ময় নিয়ে বলল:-

অয়ন দা, দেখুন! এই নীল রঙটা সাধারণ নীল নয়, এটা যেন সমুদ্রের গভীর থেকে উঠে আসা কোনো উজ্জ্বলতা। আর এই লাল? এটা ঠিক যেন আগুনের শিখার মতো জীবন্ত!

অনিমেষ বাবু নিচে নেমে এলেন। তিনি একটি কলসের গায়ে হাত রাখলেন। তাঁর শিল্পী সত্তা মুহূর্তেই বুঝে নিল যে রিচার্ডের কথা মিথ্যে ছিল না। তিনি বললেন:-

অরুণিমা, এগুলো শুধু রঙ নয়, এগুলো হিমাংশু চৌধুরীর আজীবন সাধনার ফসল। তিনি চেয়েছিলেন এমন কিছু তৈরি করতে যা রোদ, জল বা ঝড়েও ফিকে হবে না। আজ বুঝতে পারছি কেন সুলতা এই বাড়িটাকে এত আগলে রেখেছিলেন।

ঠিক তখনই বাইরে এক বিশ্রী হট্টগোল শোনা গেল। বিশু মাতব্বর তার দলবল নিয়ে মেইন গেটে হামলা করেছে। তার সাথে আছে এলাকার প্রভাবশালী এক প্রোমোটার, নাম হরেন কুন্ডু। তাদের দাবি, অদীপ্ত মারা যাওয়ার আগে নাকি এই জমির পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি তাদের নামে লিখে দিয়ে গেছে।

হরেন কুন্ডু কর্কশ গলায় চিৎকার করছিল, “অনিমেষ বাবু, গায়ের জোরে অনেকদিন খেলেছেন। এবার দলিল দেখুন। অদীপ্ত পাঁচ কোটি টাকা অগ্রিম নিয়ে এই জমি আমাদের সঁপে দিয়েছে। আপনারা আজই মালপত্র নিয়ে বিদেয় হোন, কাল এখানে বুলডোজার চলবে!”

অনিমেষ চৌধুরী শান্তভাবে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পেছনে নীলা আর অয়ন। অয়ন বলল, “হরেন বাবু, জালিয়াতির ব্যবসা ছেড়ে দিন। অদীপ্ত যে সই করেছে

তার কোনো আইনি বৈধতা নেই কারণ সে নিজেই একজন ফেরারি আসামি ছিল।

হরেন কুন্ডু অট্টহাসি হাসল। “আইন আমরা পকেটে নিয়ে ঘুরি খোকা। কাল সকালে যদি তোমরা নিজেরা না বেরোও, তবে আমি এই বাড়ি ধুলোয় মিশিয়ে দেব। দেখব তোমাদের ওই ‘মরিচা ধরা’ ইতিহাস কোথায় যায়।“

বিশু মাতব্বরের দলবল গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেল। মায়াভিলা এখন কার্যত অবরুদ্ধ। না খাবার আসতে পারছে, না ওষুধ। কিন্তু এই বিপদের মুখেও অনিমেষ বাবুর মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল।

তিনি নীলার দিকে তাকিয়ে বললেন, “অরুণিমা, ওরা যখন ধ্বংস করতে আসছে, আমরা তখন সৃষ্টি করি। আজ রাতে আমরা মায়াভিলার শেষ মহাকাব্য আঁকব। এই অমর রঙ দিয়ে আমরা এই বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে আমাদের ইতিহাস ফুটিয়ে তুলব। বুলডোজার যখন আসবে, তখন তারা ইট দেখবে না, দেখবে এক জীবন্ত সত্তা।“

শুরু হলো এক দীর্ঘ যজ্ঞ। সারারাত ধরে অনিমেষ বাবু, নীলা আর মল্লিকা মাসি মিলে মায়াভিলার প্রতিটি বাইরের দেয়ালে আঁকতে লাগলেন। যে দেয়ালগুলো আগুনের তাপে কালচে হয়ে গিয়েছিল, সেখানে অমর রঙের ছোঁয়ায় প্রাণ ফিরে আসতে লাগল। অনিমেষ বাবু আঁকলেন সুলতার মুখ, নীলা আঁকল সেই বুদ্ধ মূর্তির অলৌকিক আবির্ভাব, আর মল্লিকা আঁকলেন স্বাধীনতার সেই জয়গান।

অমর রঙের এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। রঙগুলো দেয়ালের প্লাস্টারে শুধু লেপটে যাচ্ছিল না, বরং দেয়ালের গভীরে ঢুকে গিয়ে এক অদ্ভুত দীপ্তি ছড়াচ্ছিল। রাতের অন্ধকারেও মায়াভিলা যেন জোনাকির মতো জ্বলতে শুরু করল।

পরদিন সকালে যখন হরেন কুন্ডু আর বিশু মাতব্বর বুলডোজার নিয়ে এল, তারা গেটের সামনে এসে থমকে গেল। হাজার হাজার মানুষ মায়াভিলার সামনে ভিড় করেছে। তারা কেউ লড়াই করতে আসেনি, তারা এসেছে মায়াভিলার এই নতুন রূপ দেখতে।

রাতের অন্ধকারে আঁকা সেই দেয়ালচিত্রগুলো এখন রোদের আলোয় হিরের মতো ঝিলমিল করছে। যে কেউ তাকালে দেখবে মায়াভিলা আর কোনো বাড়ি নেই, ওটা এক বিশাল ক্যানভাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হরেন কুন্ডু চেঁচিয়ে বলল, এসব ছবি দিয়ে কিছু হবে না! বুলডোজার চালাও!

কিন্তু ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করতে গিয়ে দেখল, হাজার হাজার মানুষ বুলডোজারের সামনে শুয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে আছে স্থানীয় স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিল্পী আর সাধারণ মানুষ। তারা সিনা টান করে দাঁড়িয়ে বলল, “এই শিল্প ধ্বংস করার আগে আমাদের ওপর দিয়ে গাড়ি চালাতে হবে।“

Mukto Vabuk
Works Publication

ঠিক সেই সময়েই জেলা শাসকের গাড়ি এসে দাঁড়াল। তিনি গাড়ি থেকে নেমে মায়াভিলার দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে বিমোহিত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, হরেন বাবু, আপনার দলিল ভুয়া প্রমাণিত হয়েছে। এই বাড়িটি গতকাল রাতেই রাজ্য সরকার কর্তৃক ‘জাতীয় সম্পদ’ হিসেবে গেজেটভুক্ত করা হয়েছে। এই রঙ, এই কারুকার্য এসব অমূল্য।

বিশু মাতব্বর আর হরেন কুন্ডু লেজ গুটিয়ে পালালো। মায়াভিলার গেট আজ সবার জন্য খুলে দেওয়া হলো। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঢুকে পড়ল বাগানে। তারা দেখল সেই পোড়া শিউলি গাছের গোড়ায় রঙের কারুকার্যে আবার যেন প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে।

অনিমেষ চৌধুরী তাঁর ডায়েরিতে আজ নতুন একটি কালি দিয়ে লিখলেন–

“লোভ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু শিল্প চিরন্তন। জং আমাদের চামড়া পুড়িয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের আত্মাকে অমর করে দিয়ে গেছে।”

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

বিকেলে যখন সবাই উৎসব করছিল, নীলা দেখল অয়ন এক কোণে একা দাঁড়িয়ে আছে। অয়ন বলল, নীলা, মায়াভিলা তো তার মর্যাদা ফিরে পেল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমার কাজ এবার শেষ।

নীলা অয়নের হাতটা ধরল। তার হাতের অমর রঙের দাগগুলো এখনো মোছেনি। সে বলল, অয়ন দা, মহাকাব্যের শেষ পাতায় তো রাজকন্যার সাথে বীরের

মিলন হতে হয়। তুমি ছাড়া এই মহাকাব্য যে অপূর্ণ রয়ে যাবে।

মমুক্তভাবুক

সপ্তদশ অধ্যায়

দ্বাদশ ক্যানভাস

মায়াভিলার আকাশ আজ এক অদ্ভুত শান্ত নীল রঙে ছেয়ে আছে। বুলডোজারের গর্জন আর বিশু মাতব্বরের আস্ফালন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পর বাড়িটা যেন এক গভীর ধ্যানে মগ্ন। অমর রঙের প্রলেপে মায়াভিলার দেয়ালগুলো এখন আর ইটের তৈরি মনে হয় না মনে হয় কোনো এক প্রাচীন মহাকাব্যের জীবন্ত পাতা। পর্যটক আর শিল্পীদের আনাগোনায় মরা বাগানটা আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

Mukto Vabuk
Anything Talented Works

অনিমেষ চৌধুরী আজ বারান্দায় বসে তাঁর সেই পুরনো ইজি চেয়ারটায় হেলান দিয়ে একমনে তাকিয়ে আছেন সুলতার ১২ নম্বর ক্যানভাসটির দিকে। বাকি ১১টি ক্যানভাস তাঁদের পথ দেখিয়েছে কখনো পাতালঘরের সন্ধান দিয়েছে, কখনো আইনি লড়াইয়ের অস্ত্র জুগিয়েছে। কিন্তু এই ১২ নম্বর ক্যানভাসটি এখনো এক অমীমাংসিত ধাঁধা। এতে কোনো ঘর বা মানুষের ছবি

নেই; আছে শুধু একটি বিশাল সোনালি তোরণ আর তার ভেতরে অসংখ্য ছোট ছোট বিন্দুর সমষ্টি। দূর থেকে দেখলে মনে হয় এক নক্ষত্রপুঞ্জ, কিন্তু কাছ থেকে দেখলে মনে হয় হাজার হাজার মানুষের নাম।

অরুণিমা ওরফে নীলা এক কাপ আদা চা নিয়ে পাশে এসে বসল। তার চোখে আজ এক তৃপ্তির আভা। সে বলল, দাদু, কাল থেকে তো মায়াভিলা আর্ট স্কুলের ক্লাস শুরু হবে। তিরিশজন পথশিশু আর গ্রামের দশজন প্রতিভাবান শিল্পী প্রথম ব্যাচে ভর্তি হয়েছে। দিদা কি এটাই চেয়েছিলেন?

অনিমেষ বাবু ডায়েরির পাতায় পেনটা বোলাতে বোলাতে বললেন, সুলতা সবসময় বলত, শিল্প যদি ড্রয়িংরুমের সাজসজ্জা হয়ে থাকে তবে তা মরে গেছে। শিল্পকে হতে হবে রাস্তার মানুষের বেঁচে থাকার রসদ। এই শেষ ক্যানভাসটা বোধহয় সেই বার্তাই দিচ্ছে।

হঠাৎ অয়ন এক তাড়া কাগজপত্র নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকল। তার পেছনে ডক্টর চ্যাটার্জি। অয়ন বলল, দাদু, একটা অবিশ্বাস্য খবর আছে। আমরা এই ১২ নম্বর ক্যানভাসটার বিন্দুগুলো যখন ম্যাগনিফাইং

গ্লাস দিয়ে দেখলাম, তখন এক অদ্ভুত সত্য বেরিয়ে এল। এগুলো শুধুই বিন্দু নয়, এগুলো আসলে একেকটা কোড। আর সেই কোডগুলো মেলালে এক বিশাল ট্রাস্ট ফান্ডের হদিস পাওয়া যায় যা সুলতা দিদা আর অবিনাশ কাকা মিলে তৈরি করেছিলেন।

নীলা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, ট্রাস্ট ফান্ড? কিন্তু বাবা তো সারাজীবন অভাবী ছিলেন!

ডক্টর চ্যাটার্জি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, অবিনাশ অভাবী ছিল কারণ সে নিজের জন্য কিছু রাখেনি। মায়াভিলার সেই পাতালঘরে যে ছবিগুলো ছিল, তার মধ্যে কিছু ছবি সুলতা বিদেশের গ্যালারিতে অত্যন্ত গোপনে বিক্রি করেছিলেন অদীপ্তর চোখের আড়ালে। সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ তিনি একটি আন্তর্জাতিক ট্রাস্টে জমা রেখেছিলেন শুধু একটা উদ্দেশ্যে মায়াভিলা যদি কোনোদিন শিল্পীদের আশ্রয়স্থল হয়, তবে যেন অর্থাভাবে তা বন্ধ না হয়ে যায়।

অনিমেষ বাবু স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন। সুলতা তবে শুধু অতীত আগলে রাখেননি, তিনি আগামীর শত বছরের সংস্থান করে দিয়ে গেছেন।

সেদিন বিকেলে মায়াভিলার পোড়া বাগানে এক ছোট অনুষ্ঠান আয়োজন করা হলো। মল্লিকা মাসি তাঁর দীর্ঘ কুড়ি বছরের অন্ধকার কাটিয়ে আজ প্রথম জনসমক্ষে এলেন। তাঁর হাতে সেই ট্রাস্টের উদ্বোধনী ফিতে। সুলতার সেই ১২ নম্বর ক্যানভাসটি আজ স্কুলের মূল ফটকে টাঙানো হলো।

অনিমেষ চৌধুরী মঞ্চে দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় বললেন:-

“মানুষের শরীরে মরিচা ধরে বার্ধক্যে, কিন্তু মনে মরিচা ধরে তখন যখন সে স্বপ্ন দেখতে ভুলে যায়। মায়াভিলা একদিন পুড়েছিল, কিন্তু আজ সে আগুনের চেয়েও উজ্জ্বল। আজ থেকে এই বাড়ি আর আমার নয়, এটা তোমাদের সবার যারা রঙ দিয়ে পৃথিবীকে বদলাতে চাও।“

কিন্তু উৎসবের মাঝেই এক ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হলো। গেটের বাইরে এক বৃদ্ধা ভিক্ষুক অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর হাতে একটি মলিন থলে। মল্লিকা মাসি

এগিয়ে গিয়ে তাঁকে কিছু খাবার দিতে চাইলেন, কিন্তু বৃদ্ধা তাঁর হাতটা চেপে ধরলেন।

বৃদ্ধা অস্ফুট স্বরে বললেন, মল্লিকা? তুই বেঁচে আছিস?

মল্লিকা শিউরে উঠলেন। এই কণ্ঠস্বর তাঁর চেনা। এ যে মায়াভিলার সেই পুরনো পরিচারিকা কুসুম, যাকে অদীপ্ত তাড়িয়ে দিয়েছিল কারণ সে নীলার জন্মরহস্য জানত। কুসুমের কাছেই ছিল সুলতার শেষ দিনগুলোর এক গোপন চিঠি।

কুসুম কাঁপতে কাঁপতে থলে থেকে এক টুকরো নীল কাগজ বের করলেন। দিদিমণি মরার আগে বলেছিল, যেদিন মায়াভিলায় রঙের মেলা বসবে, সেদিন যেন এই কাগজটা অরুণিমার হাতে তুলে দেই। আজ সেই দিন।

নীলা কাগজটা হাতে নিল। সেখানে সুলতার শেষ ইচ্ছা লেখা ছিল। কিন্তু সেই ইচ্ছাটা পড়ে নীলার চোখের জল আর বাঁধ মানল না।

সুলতা লিখেছেন–

অরুণিমা, আমি জানি তুই একদিন তোর পরিচয় খুঁজে পাবি। কিন্তু মায়াভিলার এই মহাকাব্য তখনই পূর্ণ হবে যখন তুই অদীপ্তকে ক্ষমা করবি। ঘৃণার মরিচা যদি মনে থেকে যায়, তবে অমর রঙও ম্লান হয়ে যায়। অদীপ্তর সেই ভস্মটুকু আজ ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দিস, তবেই মায়াভিলার আত্মা শান্তি পাবে।

অনিমেষ বাবু অবাক হলেন। যে অদীপ্ত মায়াভিলাকে ছাই করতে চেয়েছিল, সুলতা তাঁর জন্যেও শেষবেলায় ক্ষমা চেয়ে গেছেন।

সেদিন গোধূলি বেলায় অনিমেষ বাবু, নীলা আর অয়ন মিলে অদীপ্তর সেই অস্থিভস্ম নিয়ে নদীর ঘাটে গেলেন। নদীর শান্ত জলে যখন ভস্মটুকু বিলীন হয়ে গেল, তখন মনে হলো মায়াভিলার ওপর থেকে শেষ অভিশাপটা ধুয়ে মুছে গেল।

অনিমেষ বাবু নিজের ডায়েরিতে লিখলেন–

“ক্ষমা হলো সেই অমর প্রলেপ, যা ইতিহাসের সব ক্ষত সারিয়ে দেয়। আজ মায়াভিলা সত্যিই নিষ্পাপ।”

রাতে মায়াভিলায় যখন আলো জ্বলে উঠল, তখন মনে হলো প্রতিটি ইট যেন একেকটা মোমবাতি। অয়ন নীলার পাশে এসে দাঁড়াল। সে বলল, “অরুণিমা, কাল থেকে আমাদের নতুন লড়াই। সারা দেশ থেকে ছাত্ররা আসছে। আমরা কি পারব দিদার এই স্বপ্ন বহন করতে?

নীলা অয়নের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল। মরিচায় বোনা এই মহাকাব্য যদি এত ঝড় সামলাতে পারে, তবে আগামী দিনের সূর্য আমাদেরই হবে।

Anything Talented Works
Works Publication

অষ্টাদশ অধ্যায়

শিমুলের পদধ্বনি

মায়াভিলার সদর দরজায় টাঙানো সেই বিশাল সোনালি তোরণটি আজ ভোরের আলোয় ঝিকমিক করছে। গত রাতে হওয়া বৃষ্টির ছিটেফোঁটাগুলো অমর রঙের দেয়ালে হিরের দানার মতো জমে আছে। আজ মায়াভিলা আর্ট স্কুলের আনুষ্ঠানিক পথচলা শুরু। যে বারান্দায় একসময় অদীপ্তর কর্কশ গলা আর ষড়যন্ত্রের কুয়াশা জমত, সেখানে আজ শোনা যাচ্ছে চঞ্চল কিশোর-কিশোরীদের কলকাকলি।

অনিমেষ চৌধুরী আজ শুভ্র ধুতি আর পাঞ্জাবিতে সেজেছেন। তাঁর লাঠিটা আজ আর শুধু বয়সের ভার বইবার জন্য নয়, বরং এক গর্বিত সেনাপতির রাজদণ্ডের মতো লাগছে। তিনি বাগানের সেই নতুন জলাধারের ধারে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, কীভাবে মল্লিকা মাসি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে তুলি তুলে দিচ্ছেন।

মল্লিকা মাসির এই রূপটা সবার কাছেই বিস্ময়কর। ২০ বছর যে নারী মাটির নিচের অন্ধকারে শুধু নিঃশব্দে

দেয়াল আঁচড়েছেন, আজ তাঁর তুলি থেকে যেন রঙের ফোয়ারা ছুটছে। তাঁর হাত আর কাঁপছে না। বরং তিনি যখন ক্যানভাসে পোঁচ দিচ্ছেন, তখন মনে হচ্ছে তিনি তাঁর হারানো কুড়িটি বছর এক নিমেষে ফিরিয়ে আনছেন।

নীলা ওরফে অরুণিমা আজ স্কুলের প্রশাসনিক কাজ সামলাচ্ছে। অয়ন তার পাশে এক ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে। ঠিক এই সময়েই গেটের সামনে এসে দাঁড়াল এক কিশোর। তার পরনে মলিন জামা, পায়ে ছেঁড়া চটি, কিন্তু তার পিঠে বাঁধা এক বিশালাকার থলে। ছেলেটির চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলছে।

অয়ন এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, “কী নাম তোমার? এখানে কেন এসেছ?”

ছেলেটি তার থলে থেকে একটি মাটির তাল বের করল। তারপর অবলীলায় আঙুলের চাপে কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি মূর্তির অবয়ব তৈরি করে ফেলল। সেটি আর কারো নয়, স্বয়ং অনিমেষ চৌধুরীর মুখাবয়ব। ছেলেটি ধীর গলায় বলল, “আমার নাম শিমুল। আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। শুনেছি এই

বাড়িতে মরিচাও নাকি সোনা হয়ে যায়। আমাকে কি একটু জায়গা দেবেন?”

অনিমেষ বাবু দূর থেকে দৃশ্যটি দেখছিলেন। তিনি কাছে এসে শিমুলের হাতে তৈরি সেই মাটির মুখটি হাতে নিলেন। তাঁর চোখ ভিজে এল। তিনি বুঝলেন, সুলতার সেই ট্রাস্টের প্রথম সার্থকতা এই শিমুলের মতো প্রতিভাদের খুঁজে পাওয়া। তিনি শিমুলের মাথায় হাত রেখে বললেন, “মরিচা শুধু সোনা হয় না রে পাগলা, মরিচা জীবনের নতুন অঙ্কুর তৈরি করে। তুই আজ থেকে এই মায়াভিলার কনিষ্ঠতম শিল্পী।“

কিন্তু এই আনন্দের মাঝেই মল্লিকা মাসির তুলি হঠাৎ থেমে গেল। তিনি একটি ক্যানভাসে আঁকছিলেন ‘মুক্তি’র ছবি। কিন্তু ছবির এক কোণে তিনি বারবার একটি কালো ছায়া আঁকছেন। নীলা কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে মা? তুমি বারবার ওই কালো রঙটা কেন দিচ্ছ?

মল্লিকা উদাস গলায় বললেন, অরুণিমা, আলো যখন প্রবল হয়, তখন ছায়াও দীর্ঘ হয়। অদীপ্ত নেই, কিন্তু এই সমাজের মানুষের ভেতরের লোভ আর হিংসার

মরিচা কি পুরোপুরি পরিষ্কার হয়েছে? শিমুলের মতো ছেলেরা যখন এখানে আসবে, তখন বাইরের জগতের শকুনেরা আবার এই বাড়ির দিকে হাত বাড়াবে না তো?

মল্লিকার কথা শুনে সবাই একটু গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু অয়ন অভয় দিয়ে বলল, মল্লিকা মাসি, এবার মায়াভিলা একা নয়। এই ছাত্ররা, এই শিক্ষক আর অমর রঙ সবাই মিলে এক দুর্গ তৈরি করবে।

সেদিন দুপুরে স্কুলের প্রথম ক্লাস শুরু হলো। অনিমেষ বাবু ক্লাসে ঢুকলেন প্রধান শিক্ষক হিসেবে। তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে কোনো ছবি আঁকলেন না, বরং লিখলেন একটি কথা–

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

“রঙ হলো আত্মার ভাষা। তোমার তুলি যদি সত্যের হয়ে লড়ে, তবে তোমার ছবি কোনোদিন মরবে না।”

ক্লাস চলাকালীনই এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। মায়াভিলার সেই পুরনো কুয়োটার জল হঠাত ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করল। রিচার্ড হ্যামিল্টন যাওয়ার সময় যে জলাধারটি তৈরি হয়েছিল, তার নিচ থেকে একটি ধাতু

নির্মিত গোল বাক্স ভেসে উঠল। অয়ন আর শিমুল মিলে বাক্সটি তুলে আনল।

বাক্সটি খোলার পর দেখা গেল ভেতরে হিমাংশু চৌধুরীর নিজের ডায়েরি। ডায়েরির পাতায় পাতায় ছিল মায়াভিলার প্রতিটি ইটের রসায়ন এবং আরও কিছু গোপন নকশা। কিন্তু ডায়েরির একদম শেষ পাতায় একটি সতর্কবার্তা লেখা ছিল–

“মায়াভিলার শিল্প তখনই ধ্বংস হবে, যখন তার মালিকেরা নিজেদের বড় শিল্পী ভাববে। বিনয়ই হলো শিল্পের শ্রেষ্ঠ রক্ষক।”

Anything Talented Works
Works Publication

অনিমেষ বাবু বুঝতে পারলেন, এই ডায়েরিটা আসলে তাঁদের অহংকার দমনের এক মন্ত্র। তিনি ঠিক করলেন, এই ডায়েরিটি স্কুলের লাইব্রেরিতে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। কোনো জ্ঞানই গোপন থাকা উচিত নয়।

বিকেলের দিকে একদল বিদেশি পর্যটক এলেন মায়াভিলা দেখতে। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন জার্মানির বিখ্যাত

এক আর্ট কিউরেটর। তিনি মায়াভিলার দেয়ালচিত্রগুলো দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, আমি সারাবিশ্ব ঘুরেছি, কিন্তু এমন জীবন্ত রঙ আর এমন বিষাদের মহাকাব্য কোনোদিন দেখিনি। এই বাড়িটি শুধু ভারতের নয়, এটি বিশ্বের সম্পদ।

মায়াভিলা ধীরে ধীরে তার মহাকাব্যের চূড়ান্ত সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছিল। কিন্তু ১৯তম পর্বে এক নতুন সংঘাত দেখা দেবে। শিমুলের অতীত কি কোনো কালো ছায়া নিয়ে আসবে মায়াভিলায়? আর নীলা ও অয়নের সম্পর্কের পরিণতি কী হবে?

অনিমেষ চৌধুরী তাঁর রাতের ডায়েরিতে লিখলেন

মহাকাব্যের শেষ অধ্যায়ে রাজকন্যার বিদায়ে যেমন বিষাদ থাকে, তেমনি নতুন রাজার অভিষেকে থাকে আনন্দ। মায়াভিলা আজ তার নতুন রাজাদের খুঁজে পেয়েছে।

Mukto Vabuk
Anything Related Work's Publication

ঊনবিংশ অধ্যায়

মহাকবির প্রস্থান

মায়াভিলার নতুন জীবনে আজ যেন এক উৎসবের আমেজ। চারদিকে রঙের সুবাস আর ছোট ছোট শিল্পীদের কলকাকলি। কিন্তু এই উৎসবের ভেতরেই কোথাও একটা তপ্ত নিশ্বাস লুকিয়ে ছিল। শিমুল, সেই অসামান্য প্রতিভাবান কিশোরটি, গত দুদিন ধরে খুব চুপচাপ। তার সেই সাবলীল হাতের কাজগুলো যেন হঠাৎ থমকে গেছে। সে ক্যানভাসের সামনে দাঁড়ালে তার হাত কাঁপছে, যেন কোনো এক অদৃশ্য ভয় তাকে তাড়া করে ফিরছে।

অরুণিমা ওরফে নীলা বিষয়টি লক্ষ্য করেছিল। সে শিমুলের কাছে গিয়ে মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে রে শিমুল? তোর তুলি আজ কথা বলছে না কেন?

শিমুল উত্তর দিল না, শুধু বড় বড় চোখ মেলে মায়াভিলার গেটের দিকে তাকিয়ে রইল। সেখানে একটি কালো রঙের বিলাসবহুল গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি

থেকে নামলেন একজন সুবেশধারী ব্যক্তি, যার চোখে শীতল চাতুর্য। তিনি আর কেউ নন, শহরের বিখ্যাত 'আর্ট স্মাগলার' বা শিল্প চোর বিক্রম সিং।

বিক্রম সিং মায়াভিলার চত্বরে ঢুকে অনিমেষ চৌধুরীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে এক ধূর্ত হাসি। তিনি বললেন, অনিমেষ বাবু, আপনার এই মহাকাব্যের প্রচার তো পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু আপনি কি জানেন, আপনার এই শ্রেষ্ঠ ছাত্র শিমুল আসলে আমার স্টুডিওর এক পলাতক আসামী? ও আমার কিছু দামী ফর্মুলা চুরি করে পালিয়েছে।

পুরো মায়াভিলা স্তব্ধ হয়ে গেল। শিমুল চিৎকার করে উঠল, মিথ্যে কথা! আমি ওনার ওখানে ক্রীতদাসের মতো কাজ করতাম। উনি শিশুদের দিয়ে জাল ছবি আঁকিয়ে বিদেশে পাচার করেন। আমি শুধু নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি!

অনিমেষ চৌধুরী লাঠিটা শক্ত করে চেপে ধরলেন। তাঁর চোখে আগুনের আভা। তিনি বললেন, মি. সিং, মায়াভিলা গুণী মানুষের আশ্রয়স্থল, কোনো অপরাধীর

আস্তানা নয়। আর আমার বিশ্বাস, শিমুল যা বলছে তা সত্য। আপনি এখনি এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

বিক্রম সিং হাসলেন, কিন্তু সেই হাসি ছিল বিষাক্ত। এত সহজে নয় মি. চৌধুরী। শিমুলের বাবা আমার কাছে অনেক ঋণী। আর শিমুল যে 'অমর রঙের' রহস্য এখন জানে, সেটা আমার চাই। যদি না দেন, তবে কালকের সংবাদপত্রে মায়াভিলার নামে এমন কলঙ্ক ছাপানো হবে যে আপনার এই আর্ট স্কুল এক নিমেষে বন্ধ হয়ে যাবে।

সেই রাতে মায়াভিলায় আর কারো চোখে ঘুম এল না। অয়ন আর নীলা মিলে পরিকল্পনা করল কীভাবে এই আইনি লড়াই লড়তে হবে। কিন্তু শিমুল নিজেকে দোষী ভাবতে শুরু করল। সে মনে করল, তার জন্যই মায়াভিলার এই নতুন স্বপ্ন ভেঙে যেতে বসেছে। মাঝরাতে সে চুপিচুপি ব্যাগ গুছিয়ে মায়াভিলা ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

সে যখন গেট দিয়ে বেরোচ্ছিল, তখন তাকে আটকে দিলেন মল্লিকা মাসি। অন্ধকারে তাঁর চোখদুটো জ্বলজ্বল করছিল। তিনি শান্ত গলায় বললেন, পালানো কোনো

সমাধান নয় রে খোকা। আমিও ২০ বছর পালিয়েছিলাম এই পাতালঘরে, কিন্তু মুক্তি পাইনি। মায়াভিলা তোকে যে সাহস দিয়েছে, সেটাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিস না।

শিমুল কেঁদে ফেলল। মল্লিকা তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, “কাল এক চরম পরীক্ষা। বিক্রম সিং শুধু শিমুলকে চায় না, সে মায়াভিলার সেই ‘অমর রঙের’ ফর্মুলা চায় যা দিয়ে সে জাল ছবিকে আসল বলে চালিয়ে দেবে। আমরা সেটা হতে দেব না।“

পরদিন সকালে বিক্রম সিং তাঁর দলবল আর কিছু ভাড়াটে সাংবাদিক নিয়ে হাজির হলেন। তিনি দাবি করলেন, মায়াভিলার এই রঙ আসলে বিষাক্ত রাসায়নিক দিয়ে তৈরি যা শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তিনি এক সাজানো রিপোর্ট পেশ করলেন।

গ্রামের মানুষ আর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হুলুস্থুল পড়ে গেল। অনিমেষ চৌধুরী মঞ্চে উঠলেন। তিনি কোনো কথা বললেন না, শুধু শিমুলকে ডাকলেন। তিনি বললেন, শিমুল, আজ তুই প্রমাণ করবি শিল্প কোনোদিন কলঙ্কিত হয় না।

শিমুল কম্পিত হাতে অমর রঙের একটি পাত্র নিল। সে সবার সামনে মায়াভিলার সেই পুড়ে যাওয়া শিউলি গাছের গুড়িতে একটি ছবি আঁকতে শুরু করল। সে আঁকল একটি প্রদীপ, যার শিখাটি অমর রঙে এমনভাবে জ্বলজ্বল করছিল যে দুপুরের কড়া রোদেও তা ম্লান হলো না।

হঠাৎ এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটল। শিমুলের আঁকা সেই রঙের প্রদীপ থেকে যেন এক অদ্ভুত শীতল জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে লাগল। উপস্থিত সাংবাদিকরা যখন তাঁদের ক্যামেরার লেন্স তাক করলেন, তখন দেখলেন ক্যামেরার ভেতর দিয়ে সেই রঙের উজ্জ্বলতা আরও দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। বিক্রম সিংয়ের আনা সেই ভুয়া ল্যাবরেটরি রিপোর্টটি রোদে পুড়ে ছাই হয়ে গেল! প্রাকৃতিক খনিজ আর ভেষজ দিয়ে তৈরি সেই অমর রঙের বিশুদ্ধতা বিজ্ঞানের সব কারসাজি অতিক্রম করে গেল।

অয়ন ঠিক সেই মুহূর্তে পুলিশের একটি দল নিয়ে সেখানে ঢুকল। অয়ন বলল, মি. সিং, শিমুলের বাবার ঋণের কাগজগুলো আমরা আগেই পরীক্ষা করেছি, সেগুলো জাল। আর আপনার স্টুডিওতে যে শিশুদের

পাচার করা হতো, তার প্রমাণ পুলিশ পেয়ে গেছে। শিমুল চোর নয়, সে আপনার সাম্রাজ্য ধ্বংসের সাক্ষী।

বিক্রম সিংকে পুলিশ হাতকড়া পরাল। মায়াভিলার ওপর আসা শেষ মেঘটিও কেটে গেল। কিন্তু অনিমেষ চৌধুরী বুঝতে পারলেন, তাঁর সময় ফুরিয়ে আসছে। তিনি সারাদিনের উত্তেজনা সহ্য করতে পারেননি। সন্ধ্যায় যখন সূর্য ডুবছে, তিনি নীলাকে কাছে ডাকলেন।

তাঁর ডায়েরির শেষ পাতাটি তখনো খালি। তিনি নীলার হাতে পেনটা তুলে দিলেন। অরুণিমা, এই মহাকাব্যের শেষ পাতাটি আমি আর লিখতে পারব না। এটা তোকে লিখতে হবে। মায়াভিলা এখন থেকে তোর আর অয়নের। তোরা শুধু মনে রাখিস, মরিচা যেন মনে না ধরে।

অনিমেষ চৌধুরীর হাতটা ধীরে ধীরে নীলার হাতের ওপর থেকে শিথিল হয়ে এল। তাঁর মুখে এক স্বর্গীয় প্রশান্তি। মায়াভিলার প্রধান মহাকবি বিদায় নিলেন, কিন্তু তাঁর অমর সৃষ্টি রয়ে গেল উত্তরসূরিদের হৃদয়ে।

নীলা ডায়েরির সেই শেষ পাতায় লিখল–

“মহাকাব্যের শেষ নেই। এক কবির মৃত্যু মানে হাজারো নতুন কবির জন্ম। মায়াভিলার ইতিহাস এখন থেকে রক্তের কালিতে নয়, প্রাণের রঙের কালিতে লেখা হবে।”

মুক্তভাবুক

বিংশ অধ্যায়

অন্তিম মহাকাব্য

মায়াভিলার আকাশে আজ এক আশ্চর্য গোধূলি। আকাশটা ঠিক সেই রঙের, যা অনিমেষ চৌধুরী তাঁর সারাজীবনের ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন গাঢ় বেগুনি আর সিঁদুরে লালের এক অলৌকিক সংমিশ্রণ। আজ মায়াভিলার প্রধান মহাকবি নেই। তিনদিন আগে অনিমেষ চৌধুরী তাঁর প্রিয় ইজি চেয়ারে বসে শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, পুরো বাড়িতে কোথাও কান্নার রোল নেই; বরং এক গভীর, পবিত্র নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। কারণ মায়াভিলা আজ শোকের ঊর্ধ্বে এক শাশ্বত ধামে পরিণত হয়েছে।

১.১ উত্তরাধিকারের ভার

অরুণিমা (নীলা) আজ মায়াভিলার সেই বিখ্যাত ছাদটায় দাঁড়িয়ে আছে, যেখান থেকে পুরো শহরটা দেখা যায়। তার পাশে অয়ন। দুজনের পরনেই শুভ্র পোশাক। অনিমেষ বাবুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বা শোকসভা নয়, বরং আজ আয়োজিত হয়েছে এক 'রঙের উৎসব'। এটাই ছিল বৃদ্ধ শিল্পীর শেষ ইচ্ছা। তিনি বলে গিয়েছিলেন, আমার বিদায় যেন বিষাদের না হয়। আমি তো মিশে থাকব এই বাড়ির দেয়ালে, অমর রঙের রেখাচিত্রে।

নীলার হাতে অনিমেষ বাবুর সেই জীর্ণ ডায়েরিটি। যার শেষ পাতাটি গতকাল রাতে সে পূর্ণ করেছে। অয়ন ধীর গলায় বলল, অরুণিমা, মিউজিয়ামের কাজ শেষ। ইউনেস্কো থেকে চিঠি এসেছে, মায়াভিলাকে তারা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবন্ত শিল্পকলা কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু আমাদের আসল কাজ তো আজ থেকে শুরু।

নীলা ডায়েরিটা বুকের কাছে চেপে ধরল। জানো অয়ন দা, দাদু বলতেন, বাড়ি শুধু ইটের নয়, বাড়ি হয় মানুষের বিশ্বাসের। আজ যখন নিচে তাকিয়ে দেখি শিমুলের মতো ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো রঙ নিয়ে খেলছে, তখন মনে হয় দাদু মরেননি। ওই যে শিউলি

গাছটা আবার ফুলে ভরে উঠেছে, ওটাই তো দাদুর হাসি।

১.২ মল্লিকার মুক্তি

নিচে বাগানে মল্লিকা মাসি একদল শিশুকে নিয়ে বসেছেন। ২০ বছরের অন্ধকারের ক্ষত আজ তাঁর মুখ থেকে মুছে গেছে। তিনি এখন আর সেই নির্যাতিতা নারী নন, তিনি এখন মায়াভিলার বড় মা। তিনি বাচ্চাদের শেখাচ্ছিলেন কীভাবে কাদা আর পলি মাটি দিয়ে জীবনের মূর্তি গড়তে হয়। শিমুল আজ তাঁর প্রধান সহকারী।

শিমুল হঠাৎ প্রশ্ন করল, আচ্ছা মা, এই যে মূর্তিরা কথা বলে না, ওরা কি আমাদের দুঃখ বোঝে?

মল্লিকা হাসলেন। তাঁর চোখে এখন সুলতার মতো প্রজ্ঞা। মূর্তিরা কথা বলে না রে খোকা, ওরা কথা বলায়। তুই যখন একমনে কিছু গড়বি, তখন দেখবি

তোর ভেতরের সব না বলা কথা ওই মাটির দেহে ফুটে উঠছে। ওটাই মুক্তি।

শিমুল আজ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যটি তৈরি করছে অনিমেষ চৌধুরী আর সুলতা দেবী হাত ধরে মায়াভিলার গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। সেই ভাস্কর্যে কোনো শোক নেই, আছে এক অনন্ত যাত্রার আনন্দ।

১.৩. অতীতের অবশেষ

অয়ন আর নীলা বিকেলে মায়াভিলার সেই পাতালঘরে শেষবারের মতো নামল। এবার আর কোনো রহস্য বা ভয় নয়, বরং এক পরম শ্রদ্ধা নিয়ে। সেখানে সুলতার সেই ১২টি ক্যানভাস আজ স্থায়ী গ্যালারি হিসেবে সাজানো হয়েছে। কিন্তু অয়ন লক্ষ্য করল, ১২ নম্বর ক্যানভাসটির পাশে একটি ছোট কুঠুরি ছিল যা আগে দেখা যায়নি।

কুঠুরিটি খুলতেই বেরিয়ে এল একটি পুরনো গ্রামোফোন রেকর্ড। রেকর্ডটি বাজাতেই ঘরটি এক অসামান্য সরোদ

বাদনে ভরে উঠল। সেই সুর যেন মায়াভিলার প্রতিটি ইটের স্পন্দন। সুরের শেষে সুলতার কণ্ঠস্বর ভেসে এল–

“অনিমেষ, আমি জানি এই রেকর্ড যখন বাজবে, তখন মায়াভিলা তার জং সরিয়ে হিরের মতো দ্যুতি ছড়াচ্ছে। অবিনাশ আর আমি যে বীজ বুনেছিলাম, তা আজ মহীরুহ। অরুণিমা, আমার মা..তুই তোর বাবার ঘৃণা করিস না। কারণ ঘৃণা হলো সেই মরিচা যা মানুষকে ভেতর থেকে খেয়ে ফেলে। তুই শুধু মনে রাখিস, মায়াভিলা কোনো সম্পত্তি নয়, মায়াভিলা হলো এক আদর্শ।”

অরুণিমার চোখ দিয়ে জল ঝরল। আজ যেন সুলতা দেবী তাকে স্পর্শ করলেন।

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

১.৪. বিকেলের সেই ছায়া

ঠিক এই সময় মেইন গেটে একজন আগন্তুক এল। কোনো ষড়যন্ত্রকারী নয়, কোনো লোভী প্রোমোটার নয়। সে একজন সাধারণ গ্রাম্য যুবক। তার হাতে একটি জং ধরা লোহার তোরঙ্গ। যুবকটি বলল, আমার ঠাকুরদা হিমাংশু চৌধুরীর অধীনে কাজ করতেন। তিনি মারা যাওয়ার আগে বলে গিয়েছিলেন, এই তোরঙ্গটি যেন মায়াভিলার সঠিক উত্তরাধিকারীর হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়। এটি নাকি হিমাংশু বাবুর সেই 'অমর রঙের' আসল ডায়েরি।

নীলা তোরঙ্গটি গ্রহণ করল। এটিই ছিল মহাকাব্যের শেষ বিন্দু। যে ফর্মুলা রিচার্ড হ্যামিল্টন বা বিক্রম সিং চেয়েছিল, তা আজ নিজে থেকে ফিরে এল যোগ্য হাতে। মায়াভিলা এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ।

১.৫. শেষ পাতার উক্তি

সূর্য যখন পাটে বসল, তখন নীলা ডায়েরির শেষ পাতাটি আবার খুলল। সেখানে সে লিখেছে এক দীর্ঘ কবিতা, যা এই ২০ অধ্যায়ের দীর্ঘ যাত্রার সারমর্ম:-

“লোহার শরীরে জং ধরেছিল, মনে ধরেছিল শোক,
মায়াভিলা তবু দাঁড়িয়ে রইল, দেখুক অবাক লোক।
পুড়েছে কাঠ, পুড়েছে স্মৃতি, ছাই হয়েছে ঘর,
ত্যাগের রঙে ফুটেছে ফুল, আজ আমরা কেউ না পর।
দাদুর তুলি, দিদার হাসি, মায়ের শিউলি তলা,
মহাকাব্যের শেষ পাতাতেও অনেক কথা বলা।
অমর রঙে জীবন লিখি, মরিচা থাকুক দূরে,
মায়াভিলা আজও বেঁচে আছে, আমাদেরই হৃদপুরে।”

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

১.৬. এক নতুন ভোর

অয়ন আর নীলা একে অপরের হাত ধরল। মায়াভিলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে তারা দেখল, দূরে ভাগীরথী নদীটি শান্তভাবে বয়ে চলেছে। অদীপ্তর সেই বিষাক্ত অহংকার নদীতে মিশে পবিত্র হয়ে গেছে। অয়ন নীলার দিকে তাকিয়ে বলল, আর কোনো ভয় নেই তো?

নীলা হাসল। ভয় কিসের অয়ন দা? যার হারানোর কিছু নেই, তার ভয় কিসের? আমরা তো মায়াভিলাকে বিলিয়ে দিয়েছি সবার মাঝে। এখন এই বাড়ির মালিক তো পুরো পৃথিবী।

মায়াভিলার আলো জ্বালানো হলো। প্রতিটি জানলা দিয়ে বের হয়ে আসছে এক মায়াবী আভা। অন্ধকার রাতে দূর থেকে দেখলে মনে হয়, একটি বিশালাকার নক্ষত্র মর্ত্যে নেমে এসেছে। যে বাড়ির নাম একসময় লোকে ভয় বা বিস্ময়ে নিত, আজ সেই মায়াভিলা এক তীর্থস্থান।

মরিচায় বোনা মহাকাব্য শেষ হলো ঠিকই, কিন্তু শিল্পের পথে যে যাত্রা অনিমেষ বাবু শুরু করেছিলেন, তা অনন্ত। জীবন নশ্বর, সম্পত্তি বিনাশী, কিন্তু যে সৃজনশীলতা মানুষ তার উত্তরসূরির জন্য রেখে যায় সেটাই হলো আসল ‘অমর রঙ’।

মায়াভিলার প্রতিটি দেয়ালে আজ কান পাতলে শোনা যায় এক অমর সুর। সেখানে জং আর নেই, আছে শুধু এক পবিত্রময় শিল্পের প্রলেপ।

পরিশিষ্ট গল্পের মূল দর্শন

এই দীর্ঘ গল্পের ২০টি পর্বে আমরা দেখেছি কীভাবে মানুষের লোভ একটি পবিত্র শিল্পকে ধ্বংস করতে চায়, কিন্তু সত্য আর ত্যাগের কাছে তা হার মানে। অনিমেষ চৌধুরীর ধৈর্য, নীলার লড়াই, সুলতার দূরদর্শিতা আর অয়নের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা—সব মিলে তৈরি হয়েছে এক পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্য। মায়াভিলা আজ আর কোনো অট্টালিকা নয়, এটি মানুষের ভেতরের সেই শক্তির প্রতীক যা মরিচা জয় করে নিজেকে পুনর্নির্মাণ করতে পারে।

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

সমাপ্ত

লেখকের কিছু কথা

শিল্পের কি মৃত্যু হয়? নাকি ধ্বংসের ছাই থেকে সে আবার নতুন করে জেগে ওঠে? এই প্রশ্নটিই ছিল **“মরিচায় বোনা মহাকাব্য”** রচনার মূল বীজ।

মায়াভিলা কেবল একটি জরাজীর্ণ অট্টালিকার নাম নয়; এটি আমাদের হারানো ঐতিহ্য, পারিবারিক টানাপোড়েন এবং অদম্য সৃষ্টিশীলতার এক প্রতীক। আমাদের চারপাশে এমন অনেক ‘মায়াভিলা’ লুকিয়ে আছে, যা সময়ের মরিচায় ঢাকা পড়ে গেছে। কখনো লোভের আগুনে, কখনো বা অবহেলার অন্ধকারে আমরা আমাদের শেকড়কে হারিয়ে ফেলি। এই গল্পে আমি চেষ্টা করেছি সেই মরিচা সরিয়ে ভেতরের উজ্জ্বল সত্যটিকে তুলে ধরতে।

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

অনিমেষ চৌধুরীর হাহাকার থেকে শুরু করে অরুণিমার নীলা জেগে ওঠা পর্যন্ত প্রতিটি পর্ব আমার কাছে ছিল এক একটি দীর্ঘ সফরের মতো। সুলতা দেবীর সেই বারোটি রহস্যময় ক্যানভাস আসলে জীবনের বারোটি

ভিন্ন ভিন্ন পাঠ, যা আমাদের শেখায় ক্ষমা এবং শিল্পের চেয়ে বড় কোনো সত্য এই পৃথিবীতে নেই।

গল্পটি যখন লিখতে শুরু করি, তখন ভাবিনি এটি বিশটি পর্বে এক মহাকাব্যিক রূপ নেবে। পাঠকদের অকুন্ঠ ভালোবাসা এবং প্রতিটি পর্বের সাথে তাঁদের একাত্মতা আমাকে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে প্রেরণা জুগিয়েছে। আশা করি, মায়াভিলার প্রতিটি ইটের কান্না এবং বিজয়ের হাসি আপনাদের হৃদয়ে দীর্ঘস্থায়ী দাগ রেখে যাবে।

পরিশেষে বলি, মানুষের মনে যদি একবার শিল্পের 'অমর রঙ' লেগে যায়, তবে কোনো মরিচাই তাকে গ্রাস করতে পারে না। গল্পটি পড়ার সময় যদি আপনার মনে হয় আপনিও মায়াভিলার সেই বাগানে শিউলি ফুলের গন্ধ পাচ্ছেন, তবেই আমার এই শ্রম সার্থক হবে।

সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও ভালোবাসা।

– **সাদিকুল ইসলাম**

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

লেখক পরিচিতি

নাম: সাদিকুল ইসলাম

পিতার নাম: সেলিম রেজা

মাতার নাম: শরিফা খাতুন

পরিচয়: **সাদিকুল ইসলাম বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান। বর্তমানে তিনি বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। পেশাগত ও শিক্ষা জীবনে তিনি বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এ পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট এ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করছেন।**

সাহিত্যিক জীবন: গল্প এবং উপন্যাসের মায়াবী বুননে সাদিকুল ইসলাম একজন উদীয়মান প্রতিভা। তাঁর লেখায় সমসামিয়িক জীবনবোধ এবং সম্পর্কের গভীরতা অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটে ওঠে। "মরিচায় বোনা মহাকাব্য" তাঁর একটি অনন্য সৃষ্টি, যা পাঠকদের এক রহস্যময় ও শিল্পমন্ডিত জগতের স্বাদ দেয়।

গ্রন্থসমূহ: উপন্যাস: অনন্তের বাঁকে তুমি
কাব্যগ্রন্থ: আমাদের ছোট গ্রাম

Mukto Vabuk
Anything Talented Works
Works Publication

মুক্তভাবুক